নির্বাসিত নজরুল। হতাশ চা-বলয় জবাব দিল। কদর পায়না ডুয়ার্সের চলচ্চিত্র

এখন ডুয়ার্স

জুন ২০১৮। ১২ টাকা

রবি ঠাকুর
রয়ে গেলেন
মনোজ্ঞ মঞ্চেই!

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

ক্রাইম থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

ছোটদের বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা

সিকিম।
সংকলন। ২০০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।
২য় খণ্ড ১৫০ টাকা

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।
তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা

সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা

পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
মেইল করুন dooarsbooks@outlook.com **বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।**
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যাবে (বই না পেলে সরাসরি অর্ডার করুন আমাদের)

শিলিগুড়ি: হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড কাস্টমস বিল্ডিং সংলগ্ন। **ইকনমি বুক স্টল,** কলেজ রোড। **বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: আড্ডাঘর,** মার্চেন্ট রোড। **গ্রন্থ ভারতী,** ডিবিসি রোড। **আলিপুরদুয়ার: শ্যামলী বুক ডিপো,** নিউটাউন। **কোচবিহার: এস বি বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স,** রূপনারায়ণ রোড। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** গ্রন্থভারতী। ধানসিঁড়ি। ওয়েস্ট দিনাজপুর বুক সাপ্লাই এজেন্সি। **কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট।

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের কলমে ৫

কবি পক্ষের প্রতিবেদন

রবি ঠাকুর রয়ে গেলেন মনোজ্ঞ মঞ্চেই ৮

নির্বাসিত নজরুল ১২

প্রতিবেশি পিএনপিসি

কোচবিহারের কড়চা— প্রথম তিন তারকা ১৫

দিনাজপুরের দিনকাল— ধানসিঁড়ির সংগ্রহশালা ১৮

বইপত্র

জলপাইগুড়ির ইতিহাস ১৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের চলচ্চিত্র— শুটিংয়ের স্বর্গ হলেও হালে পানি পায় না ১৯

উত্তরপক্ষ

বোতলের জল পান কতটা নিরাপদ? ২১

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

দুই গ্রাম এক ভোট দুই রাত ২২

পর্যটন

সিঙ্কোনা স্যালামান্ডার সেলপু ২৪

শ্রীমতি ডুয়ার্স

মনীষিতার গান আশ্বাস দেয় মনে ২৭

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া ২৮

চেল পাড়ের চারুলতা ৩০

শিশু কন্যা ধর্ষণ রুখতে ফৌজদারী আইনের সংশোধন ৩১

জ্যোৎস্না রাতের লম্বা ভূত যে হাতছানি দিয়ে ডাকে! ৩২

অম্বুবাচী ও সুহাসিনী কথা ৩৬

পুরাণ অফুরান

উলূপী এক উল্কা কন্যা ৩৪

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকক্রীড়া ৪৪

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

শালবনে রক্তের দাগ ৩৭

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৪১

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের ডিশ ৩০

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৪৫

প্রচ্ছদ ছবি: আনন্দ চন্দ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ শান্তনু সরকার
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস
হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৮৫৩৮৮২২৪০৪

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি) ৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাচারি মোড় ৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার, বাস স্যান্ড ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

আগামী সংখ্যায়

নয়া পঞ্চায়েত নবগ্রাম

ডুয়ার্সের এক একটি প্রত্যন্ত ব্লকে ঘুরে বেড়াবে ‘এখন ডুয়ার্স ব্যুরো’। অজ্ঞাত-পরিচয়ের এই সফরে উঠে আসবে গ্রামের উন্নয়ন, সম্ভাবনা, মানুষের দিন গুজরান, ইকো পর্যটনের হদিস ইত্যাদির প্রকৃত চিত্র। সময়ের এই দলিল প্রয়োজন হবে সাধারণ মানুষের ও গবেষকের। ডুয়ার্সের একপ্রান্তের মানুষ অন্যপ্রান্ত নিয়ে কিছুই জানেন না এই অপবাদ ঘুচবার সুযোগ হয়েছে এইবার।

এবার ‘হাংরি রিপোর্টার’ প্রকাশিত হল না লেখকের অসুস্থতার কারণে, তার জন্য দুঃখিত।- সম্পাদক

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস। মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

মন চায় মোর চায়

DOOARS

Mon Chai More Chai

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

যৌথ পরিচালনায়

শ্রীমতী ডুয়ার্স

এখন ডুয়ার্স

THE addaghar CLUB

A Community Development Project by NATIVE ECO SUSTAINABLE TOURISM SOCIETY

সম্পাদকের কলমে

এত বাড়াবাড়ির প্রয়োজন হল কেন?

এমন ভোট নাকি কেউ আগে কখনও দেখেনি! গাঁয়ের বাড়ির কালিপুজো উপলক্ষে কলকাতা থেকে সবান্ধবে বেড়াতে এসে প্রবাসী ভূমিপুত্র জানালেন, ব্লকের সভাপতি বাল্যবন্ধু উৎসাহের আতিশয্যে সবাইকে নিয়ে গেলেন বুথে, প্রত্যেককে ভোটও দেওয়ালেন, 'সেই পুরনো দিনের মতো ব্যালট পেপারে নস্টালজিক বিস্ময়ে', সাক্ষী হয়ে রইল আঙুলের কালি। রোজ সকালে শহরে আসা কাজের দিদি রান্নার মাসিরাও বললেন একই কথা, ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর সবার আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়া হল, তারপর বলা হল, বাড়ি চলে যাও তোমাদের ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, পরে 'ভোট দিতে পারিনি' এ কথা কেউ বলতে পারবে না। এমন ভোট আগে কখনও করিনি, বলছেন ভোটকর্মী হয়ে ঘুরে আসা স্কুলশিক্ষক, আতংকের জাল যেন ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল চারপাশে, নির্বাক দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না (ফলে ভোটকর্মী প্যাঁদানোর খবরও খুব একটা মেলেনি)। জেলাশাসকের দপ্তরের এক কর্মচারীর ভোটগণনার অভিজ্ঞতাও এবার অভিনব, বিরোধী দল বেপাত্তা, দাদাস্থানীয় প্রার্থীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন গণনাকেন্দ্র, দাবি করছেন বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যালটগুলিকে তাদের দিকেই রাখা হোক, কারণ ভোটগুলি আসলে নাকি তাদেরই! যেমন গণনা চলাকালীন কোথাও ছাপ্পা চলল বা বিজয়ী ঘোষণা করে দেওয়ার পর জয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া হল পরাজিত প্রার্থীকে— এসব (উড়ো) খবর কিন্তু দাবি করে এমন ভোট সত্যিই আগে কেউ দেখেনি!

অভিনবত্ব বলুন কিংবা বাড়াবাড়ি, তা তো ছিলই, কমবেশি স্বীকার করে নিয়েছেন নেতারা। শ্রদ্ধেয় এক সিনিয়র সাংবাদিক বলছিলেন, গ্রামের ভোটে হিংসা-রক্ত-মৃত্যু নতুন কিছু নয় ছিল-আছে-থাকবে। অপ্রিয় হলেও চরম সত্যি। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সেই অঞ্চলের ভাতা অনুদান সব মিলিয়ে খুব কম করে হলেও বছরে দু-তিন কোটি খরচের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে তার পরিমাণ নাকি দশ কোটিও ছাড়িয়ে যেতে পারে! প্রতিবেশির হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে ওঠা গাঁয়ের ক'জন মেনে নিতে পারে বলুন? স্মাগলিং করে বিপুল অর্থ করতে তবু দম লাগে, তা সবার কম্মো নয়। কিন্তু একজন প্রধান হতে আজ কোনও বিশেষ যোগ্যতা লাগে বলুন তো? ওপরে নিয়মিত নোটের বাণ্ডিল পাঠানো? ওতো সবাই পারে! অল্প সময়ে অর্থাগমের এর চেয়ে সহজ রাস্তা আজ আর কি আছে? অতএব সেই অর্থ অনর্থ বাধাবেই, এতে গেল গেল রব তোলার কিছু নেই। পঞ্চায়েতের ভোট মানে হিংসা অবধারিত! ক্ষমতাসীন সরকারের নীরব প্রশ্রয় থাকবে বলাই বাহুল্য। দেখছেন না আজ পর্যন্ত সেই কাগজের ব্যালটই রেখে দেওয়া হয়েছে, পাল্টাবার গরজ কেউ দেখায়নি!'

বাড়াবাড়ি বলতে এবার তাহলে নতুন কী ছিল? 'পুরো রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছিল এক আশ্চর্য আতঙ্কের বাতাবরণ। ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে থাকে গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে। ভোটের এক হপ্তা আগে থেকেই বাসে ভিড় নেই, পথঘাটে জ্যাম নেই। ভোটের আগে ভোটকর্মীদের এমন নাম কাটাবার হিড়িক বা এরকম ত্রাস দেখা যায়নি ইদানীংকালে। হিংসার পারদকে এক উচ্চগ্রামে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই আতঙ্ক আর সেই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের চূড়ান্ত বেপরোয়া মনোভাব। যা পরিসংখ্যানের বিচারে ধরা পড়বে না সেভাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে সরিয়ে রাখতে পারে ঘটনাস্থল থেকে। বাস্তবেই শহরবাসীরা নিজেদের গৃহবন্দী করে রেখেছিল গ্রামের ভোটের দিন। ডুয়ার্সের শান্তি ভঙ্গ হয়েছে হিংসার ভাইরাস আমদানিতে— এটাই এবার হিংসার মাত্রা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কেল'। জনৈক 'ভূতপূর্ব বামপন্থী' নাট্যকার (অধুনা সুপ্তবাম ও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক) জানালেন তাঁর এই 'অবজার্ভেশন' এবং একই সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়ার উদারতা, সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত 'সেইসব পুরনো কারিগরেরা' বেঁচে থাকলে নাকি হেরেই যেতেন এই নতুন বিদ্যার কাছে, এবার এমনই আশ্চর্য পরিকল্পিত ছক বলে মনে হয়েছে তাঁর।

আসল প্রশ্নগুলি উঠছে কিন্তু ঠিক এইখানেই —কেন এই বাড়াবাড়ি? সত্যিই কতটা প্রয়োজন ছিল এর? না করলে কি ফলাফলের বিরাট কিছু তারতম্য হতে পারত? বিরোধী শক্তিকে এখনও যেখানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় সেখানে লড়াইটা আসলে কার সঙ্গে? শুধুই কি আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? সে তো স্থানীয় স্তরে এবং কলকাতার নেতাদের সযত্নে-লালিত ক্ষত, সেখানে সুসংহত একটি ছক করবার প্রয়োজন হবে কেন? তবে কি গ্রামীণ স্তরে কোনও বিপ্লব বা বিরোধী অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত? কোনও ব্যাপক অসন্তোষ মাটি ভেদ করে উঠে আসবার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল কি? সব কেমন বোকাবোকা শোনায় না? না হলে হিংসা-সন্ত্রাসের বাড়াবাড়িতে আজ যে বদনাম অর্জন হয় কাল তা সুদে আসলে চোকাতে হয় সেটুকু বোধশক্তি ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের নেই তা মানতে হবে? নাকি 'মুকুল হইতে সাবধান' নীতিই ছিল এই বাড়াবাড়ি কার্যক্রমের মূল কারণ?

বিরোধী শক্তিকে এখনও যেখানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় সেখানে লড়াইটা আসলে কার সঙ্গে? শুধুই কি আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? সে তো স্থানীয় স্তরে এবং কলকাতার নেতাদের সযত্নে-লালিত ক্ষত, সেখানে সুসংহত একটি ছক করবার প্রয়োজন হবে কেন? তবে কি গ্রামীণ স্তরে কোনও বিপ্লব বা বিরোধী অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত? কোনও ব্যাপক অসন্তোষ মাটি ভেদ করে উঠে আসবার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল কি? সব কেমন বোকাবোকা শোনায় না? না হলে হিংসা-সন্ত্রাসের বাড়াবাড়িতে আজ যে বদনাম অর্জন হয় কাল তা সুদে আসলে চোকাতে হয় সেটুকু বোধশক্তি ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের নেই তা মানতে হবে?

এসব কোনও প্রশ্নেরই কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর মিলবে না। না মিললেও ক্ষতি নেই। বরং বাংলা ছবির নির্মাতারা যদি এর থেকে একটু অন্যরকম ফিল্মি কিছু উপাদান খুঁজবার চেষ্টা করেন তবে ক্ষতি কী? যেমন মনে করে দেখুন, ক্ষমতায় আসবার পর প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের গ্রীষ্মে গ্রামবাংলা কেমন ছেয়ে গিয়েছিল মুকুলে! কেবলমাত্র 'অর্থের নিরিখেই ক্ষমতা প্রদান' নীতিতে সামগ্রিক বিস্তার যে বেনোজলে ভাসিয়ে দিয়েছিল গোটা রাজ্যকে, সেটাও নিশ্চয়ই ভোলেননি কেউ? এবার কল্পিত গল্পটা হল, সেই বেনোজলে ভেসে এসেছিল বহু বিষবৃক্ষের বীজও। তারপর বন্যার সময়ে কিছু পৌঁছে গিয়েছিল সদর দপ্তরের অন্দরমহলেও, সবার অলক্ষ্যে। সেইসব বীজ গত পাঁচ বছরে শক্তপোক্ত গাছে পরিণত হয়েছে। আজ যখন ঈশান কোণে কালো কালো মেঘ দেখা দেয়, নিঃশব্দে সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই তরুণ বিষগাছেরা, বাতাস ভরে ওঠে গভীর ষড়যন্ত্রে, বিষক্রিয়ায় টপাটপ নিস্তেজ হয়ে যায় আশপাশের বড় বড় পুরানো গাছ। এক্কেবারে স্পেশাল এফেক্টের সায়েন্স ফিকশন! তার পরেরটুকু যেন জিরো জিরো সেভেনের কাহিনির মতই। কোনও গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতিব্যস্ত করে দেয় সদর দপ্তরকে, সে সুযোগে ক্ষমতার রাশ ধরে ফেলে ছদ্মবেশি এজেন্ট বা পাওয়ার-ব্রোকারের দল, তারপর তাদেরই অঙ্গুলিহেলনে চলতে থাকে সব অস্বাভাবিক কর্মকান্ড, শাসককে অপদস্থ করার সুচতুর গোপন খেলা। ছবিতে লাল-ফিকে- হয়ে-গেরুয়া পরিহিত মিছিল থাকবে, মাওবাদী ভূত থাকবে, কুস্তি-দোস্তির বিশাল হোর্ডিং থাকবে, আর থাকবে বড় বড় ডিগবাজিগর। শেষ অংকে বল্গা হরিণের এক বিশাল পাল, সেই বিষগাছের পাতা চিবিয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণহীন, লণ্ডভণ্ড করে বেড়াচ্ছে নিজেদের বেঁচে থাকার তৃণভূমি, শিংয়ের গুঁতোয় মেরে ফেলছে প্রতিবেশিকে। ডিগবাজিগররা সব জোঁকের মতো ডিগবাজি খেতে খেতে পালিয়ে যাচ্ছে অন্য ঘাসের সন্ধানে। অন্ধকার হয়ে আসার আগে টের পাওয়া যাচ্ছে প্রান্তরের দখল নিচ্ছে ভিনগ্রহবাসী।

এরকম টানটান ফ্যান্টাসি ফিকশন ছবিতে গান-টান রাখবেন নাকি আবার? থাক, কী প্রয়োজন অযথা বাড়াবাড়ি করার?

খুচরো ডুয়ার্স

লেটপ্রেস

হাওড়া থেকে দৌড় শুরু দুপুর দুটোয়। এনজেপিতে এসে থামার নিয়ম রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। না না! পরদিন নয়, সেদিন রাতেই। এ কী আর এলেবেলে টিরেন আছে বাবু! ইয়ে তো শাতাব্দি আক্সপেস! বহোৎ তেজ ভাগতা। —তা তো ভাগতা রে ভাই! কিন্তু মাসখানেক ধরে দেখছিস না কেমন হাওড়া প্যাসেঞ্জারের মতো হামা টেনে আসছে! মাঝে মধ্যে তো ভোর ছ-টায় ঢুকছে রে! ব্যাপারখানা কী? লাইনে মাঝে মাঝে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে নাকি যে থমকে থমকে আসবে? —আরে রাম রাম বাবু! শতাব্দি মতলব সেঞ্চুরি বানায় ফেল্লো! তব তো সিনিয়ার সিটিজেন বনে গেল বাবু! শও সাল উমরমে কী ভাবে রান করবে বোলেন? —ঠিক ঠিক! তোর বুদ্ধি আছে আচ্ছেদিননাথ! আমরা বেশি খচ্চা করি শতাব্দিতে চড়ার জন্য। পাঁচ ঘণ্টা লেট মানে পাঁচ ঘণ্টা বেশি শতাব্দিময় হয়ে থাকা। এর জন্য পয়সা বেশি নিচ্ছে গম্মেন্ট? পাব্লিক মাইরি পারেও! —হাঁ বাবু! পুরান মে এইসন ট্রেন কো লেটপ্রেস বোলেছে। শাতাব্দি লেটপ্রেস! বহোৎ খুব!

চিতামাশা

শিলিগুড়ির শপিং মলে সেদিন চাঁদের আলোয় যে চারপেয়ে কাস্টমারটি ঢুকবে বলে ভেবেছিল, সে গেল কোথায়? সে কি জানে না যে শপিং মলে ভাগারের মাংস পাওয়া যায় না? এ সব জানার উপায় নেই কেননা সেই কাস্টমার ওরফে অজানা-অজ্ঞাতকুলশীল-রহস্যময় চিত্রব্যাঘ্র (চিতাবাঘের তৎসম চেহারা) তারপর থেকে বিলকুল ভ্যানিশ! সে কি শিলিগুড়িতেই আছে, নাকি লাগোয়া অরণ্যে ফিরে হরিণ মারছে— তা জানাই যাচ্ছে না। এদিকে রাস্তায় মিলছে রহস্যময় ডেডবডি। কুকুরদের। তা কত্তা! চেষ্টা কিন্তু কম করছে না গম্মেন্ট। প্রথম দিন আরেকটু হলেই ধরে ফেলছিল। তবে বুঝতেই পারছেন। চিতা বলে কতা! ড্রোন উড়িয়েও ধরতে পারছে না। তা ছাড়া, লোকে বলে শিলিগুড়িতে লুকিয়ে থাকা সোজা। চিতাটা সেই সুবিধে এনজয় করছে। তবে ধরা সে পড়বেই! নিশ্চিত! কেন এত সিওর হচ্ছি কত্তা? শপিং মলের টানে যে চিতা পড়েছে, তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফাঁন্দে পড়িয়া বাঘা কান্দিবে রে! (পুনশ্চঃ ব্যাটা ধরা খেয়েছে আর শিলিগুড়িতে জোর জঙ্গল সাফাই হচ্ছে যাতে আবার এলে লুকোতে না পারে)

রক্তাল্পতা

শাস্ত্রে নাকি বলে যে ব্লাড ব্যাঙ্কের আশপাশে মশা না থাকলে বুঝতে হবে সেখানে রক্তের আকাল চলছে। এমনিতে ডুয়ার্সের ব্লাড ব্যাঙ্কে টাকা থুড়ি রক্ত রাখতে কেউ যেচে আসে না। মাঝে জোর প্রচার চালিয়ে, রাজসিক ভোজন আর উপহারের টোপ দিয়ে শিবির বসিয়ে কিছু কিছু হিমগ্লোবিন মিলছিল। কিন্তু ভোটে কাঠি পড়েছে কি যে যার রক্ত নিজের শরীরে লক করে দিয়ে হাওয়া! ব্যাঙ্কমুখো হচ্ছেই না পাব্লিক। রায়গঞ্জে রক্তব্যাঙ্ক এই রকম শক্ত সমস্যায় পড়েছে। তবে সে একা নয়। উত্তরের সব ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে মশারা। কিন্তু মামা! ভোটের সঙ্গে রক্তদানের কী সম্পর্ক? —আহা! বুঝলি না! পাব্লিক কে বেডে শুইয়ে হাতে সুচ ফুটিয়ে ড্রপে ড্রপে ব্লাড দিলে কি ভোট উৎরোবে? এখন চাই ঝট করে খানিকটা রক্ত। তাই ব্লাড এখন পাব্লিক বডিতেই স্টক করে রাখছে। এটাকে বলে 'ব্লাডোব্যাঙ্কিয়াল অ্যানিমিয়া কজড বাই ইলেক্টোরাল ভাইরাস।' লিখে রাখ!

ডুয়ার্সে

ও কে যায় দিনের বেলায় টর্চ হাতে? প্রার্থি নাকি? বেদে পড়েছি গ্রীসদেশের কোন এক কে জানি দিনের বেলায় লণ্ঠন জ্বেলে মানুষ খুঁজে বেড়াত —তোমারও কি একই ব্যামো? অ। তাই কও! টর্চ লাইট হইল তোমার সিম্বল। —আরে ওটা কে যায়? ভানু নাকি? তাই তো! ঐ যায় ভানু রায়, রানু রায়, দিনু বোস। তা গোমড়া মুখে বিড়বিড় করছ কেন বাবারা? অ। আদালতকে গালি দিচ্ছ? বিনা কনটেস্টে জিতেছিলে বুঝি? আহা! —ওমা! এ কী! কালই যে তোমায় দেখলুম দাড়ি কামিয়ে চকচকে গালে হেঁটে যাচ্ছ, এখন সেই গালে ব্যান্ডেজ এল কী ভাবে? অন্য গোষ্ঠে ঢুকে পড়েছিলে নাকি? এই দ্যাখো! ঠিক ধরেছি না? আহাঃ! এদিকে এটা আবার কে কাঁদছে? কী হয়েছে খোকা? শাসক দল মেরেছে? কেন দাঁড়াতে যাস বল দিকি? —ও কী! কোথায় চললেন? কালবাদে পরশু যে ভোট! হাতে নতুন ঝান্ডা নিয়ে চললেন কোথায়? ডাকছে? কে? তাই বলুন! উন্নয়ন।

স্বাধীনতার মূল্য

রোজ রাত্তিরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ডগু কেবল চেয়ে চেয়ে দেখত। এমনিতে সে আছে বহাল তবিয়তে। মালকিনের খাতির-যত্নের অভাব নেই —কিন্তু শেকল। দিনে ঘরবন্দি। রাতে শেকলাবদ্ধ হয়ে দুয়ার পাহারা। বাইরে রাস্তায় জাতকুলহীন, হীনস্বাস্থ্য, বিপিএল মার্কা ডগুর দল যখন লেজ উঁচিয়ে দৌড়ে যায় তখন শেকল ডগুর বুক ফাটে! আহা! এইজন্যই কবি লিখেছিলেন, 'বনের ডগু বলে না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব'! সত্যিই তো! স্বাধীনতাহীনতায় কে ভৌ দেয় হে কে ভৌ দেয়? তা, ডগুর এই অন্তর স্পর্শ করেছিল কাউকে। সেদিন গহীন রাতে সে ঢোকে ডগুর মালকিনের বাড়িতে। দুয়ারে দাঁড়ায়ে শেকল ডগু

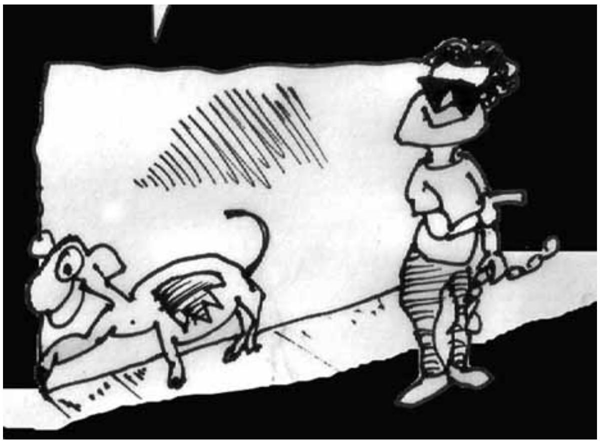

ভৌ দিতেই তাঁহারা শেকল খুলে দিতে থাকে। আনন্দে ডগু প্রায় মূর্ছা যায়। তারপর শেকল খুলে ফেলতেই ডগু স্বাধীনতার গলিপথ দিয়ে নতুন স্ট্রিট লাইট শরীরে মেখে পৌঁছে গেল নতুন সকালে। মানে সকাল বেলায় ফিরল। কিন্তু এ কোন সকাল? মালকিনের প্রায় লাখখানেক টাকা সমেত আরো জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে স্বাধীনতার অগ্রদূত! নকশালবাড়ির এক গ্রামে। হায় ডগু! স্বাধীনতার মূল্য তুমি কী বুঝিবে!

গোষ্ঠি পুতুল

আচ্ছা কত্তা! কুশপুত্তলিকা কখন বার্ন করে। মনে করুন আমি লটারি পেলাম, তা হলে কি আমার কুশপুতুল পোড়ান হবে? আহা! চটছেন কেন? এই নিন আফিমের কৌটো। মানছি উল্টোপাল্টা বকছি, কিন্তু ভোটের ফল পাকতেই খবর পেলাম ধূপগুড়িতে আমার সাগাই জিতেছে। তা গেলাম বেলাকোবার চমচম এক হাঁড়ি নিয়ে ধূপগুড়ি। আচ্ছা কত্তা, ভোটে জিতলে পাব্লিক কী করে? সাপোর্টারেরা আবির মাখে, মিষ্টি খাওয়ায়, বোমা ফাটায়, বিরোধি ঠ্যাঙায় —মানে কাজের তো অভাব থাকে না, তাই না? আমিও সেটাই ভেবেছিলুম গো! তা গিয়ে দেখি খুব হৈ চৈ হচ্ছে। ধুমধাম করে বুড়ির ঘর পোড়াচ্ছে। একটু পরে বুঝলাম পুড়ন্ত বস্তুটি হল কুশপুতুল! নতুন স্টাইল! হেরে যাওয়াদের কুশপুতুল পোড়ান। তা কত্তা ছবি তুলে ফেবুতে দেব বলে পিএলএক্স মর্টিন ফিফটি নাইন ফি ফাইভ পয়েন্ট ওমেগা থ্রি ক্যামেরাটা বের করে যেই তাক করেছি, দেখি যে জিতেছে সেই সাগাই-এরই কুশপুতুল পোড়াচ্ছে গো! যারা পোড়াচ্ছে আর যে পুড়ছে —সবাই এক পতাকার লোক! সেম ফ্ল্যাগ ব্রাদার। সত্যি বলছি কত্তা! এই দেখুন হাই রেজুলেশন ইমেজ। একটুও ফোটোশপ মারি নি। না না! ওরা কেউ আফিম খায় না। রহস্যটা পড়ে জেনেছি। গোষ্ঠী ফাইট।

টয় নয়

ছোট খোকা দুপুরে বেশ খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবে

বলে ঘরে ঢুকেছিল। ঘরের মধ্যে মেঝে, মেঝের ওপর বিছানা, বিছানার ওপর চাদর, সেই চাদরে বডি রাখতে গিয়ে খোকা দেখল, এ কী! দেখেছে কান্ড! ভয় দেখাবার জন্য জানলা দিয়ে টয় স্নেক ফেলে দিয়ে গেছে বিছানায়! তা খোকা কি ভয় পায় টয়কে? সে টয়স্পর্শ করতেই ম্যাজিক! না না! ম্যাজিক নয়! নয় পরাবাস্তব! এ যে কড়াবাস্তব! টয় নয়। অরিজিনাল কালনাগিনী! তারপর চিৎকার, ধুন্ধুমার! শেষে স্থানীয় সর্পবিশারদের আগমন এবং কালনাগিনী গ্রেপ্তার। যাক বাবা! বাসর ঘরে কালনাগিনী ঢোকে, সে নিয়ে মনসামঙ্গলে ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ব্যাচেলের ছোট খোকার ঘরে তোর কী কাজ রে? শাস্ত্র পড়িস নি নাকি? ঘটিয়াছে ওদলাবাড়িতে।

টুক্রাণু

হলদিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নাকি নিয়মিত স্বাস্থ্যপানের আসর বসে। ডুয়ার্সে আলুর দাম পেয়ে চাষী আলুলায়িত। কুকুরজানে ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হেডস্যার ঘেরাও পড়ুয়াদের। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতাগামী সরকারি বাস লাটে। ভোট যে শেষ তা ভুলে যাওয়ার কারণে দিনহাটায় গোষ্ঠীযুদ্ধ চলছেই। বেঙ্গল সাফারির বাঘু শিলার তিনটে নুড়ি জন্মেছে। তালমা হাটে সবাই যখন ভোট দিতে গেছে তখন ছাগল চুরি করেও শেষরক্ষা হল না চোরের। হলদিবাড়িতে রাজ আমলের হাসপাতালটি বাসস্থান হিসেবে কেনার জন্য ভূতেরা প্ল্যান করছে।

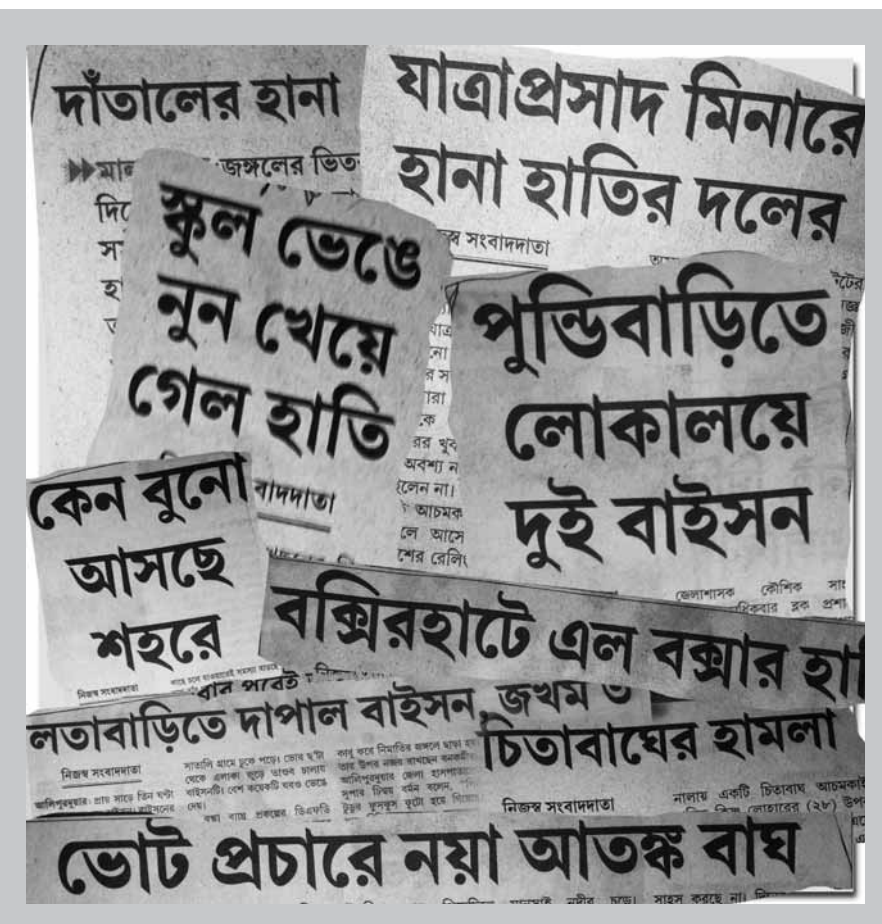

ছড়রা

বনের মন্ত্রীটা ফের কায়?

হাতি আসি লাথথি মারিল ওয়াচ টাওয়ারে, ভাগ
তেনার গ্রামে ঘুরি বেড়াইল রয়াল বাংলা বাঘ
প্যাট ফাটে দেয় বাইসনে আর ঘরত ঢোকে চিতা
তিনি নাকি বিরক্ত হন, মোর আসে যায় কী তা?

জানোয়ারেরা দল গড়েছে বনতান্ত্রিক পার্টি
মুখোশ পরা নরপশু যে জঙ্গল করে ডার্টি!
মানষি যত জন্তু হয় হোক প্রতিবাদ একটাই
কন তো হামার মন্ত্রীটা কায়, অ্যালাও দ্যাখং নাই!!

সনাতন চন্দ

চাষের মাঠে হাল ধরতে চেয়েছিলেন বিশ্বকবি

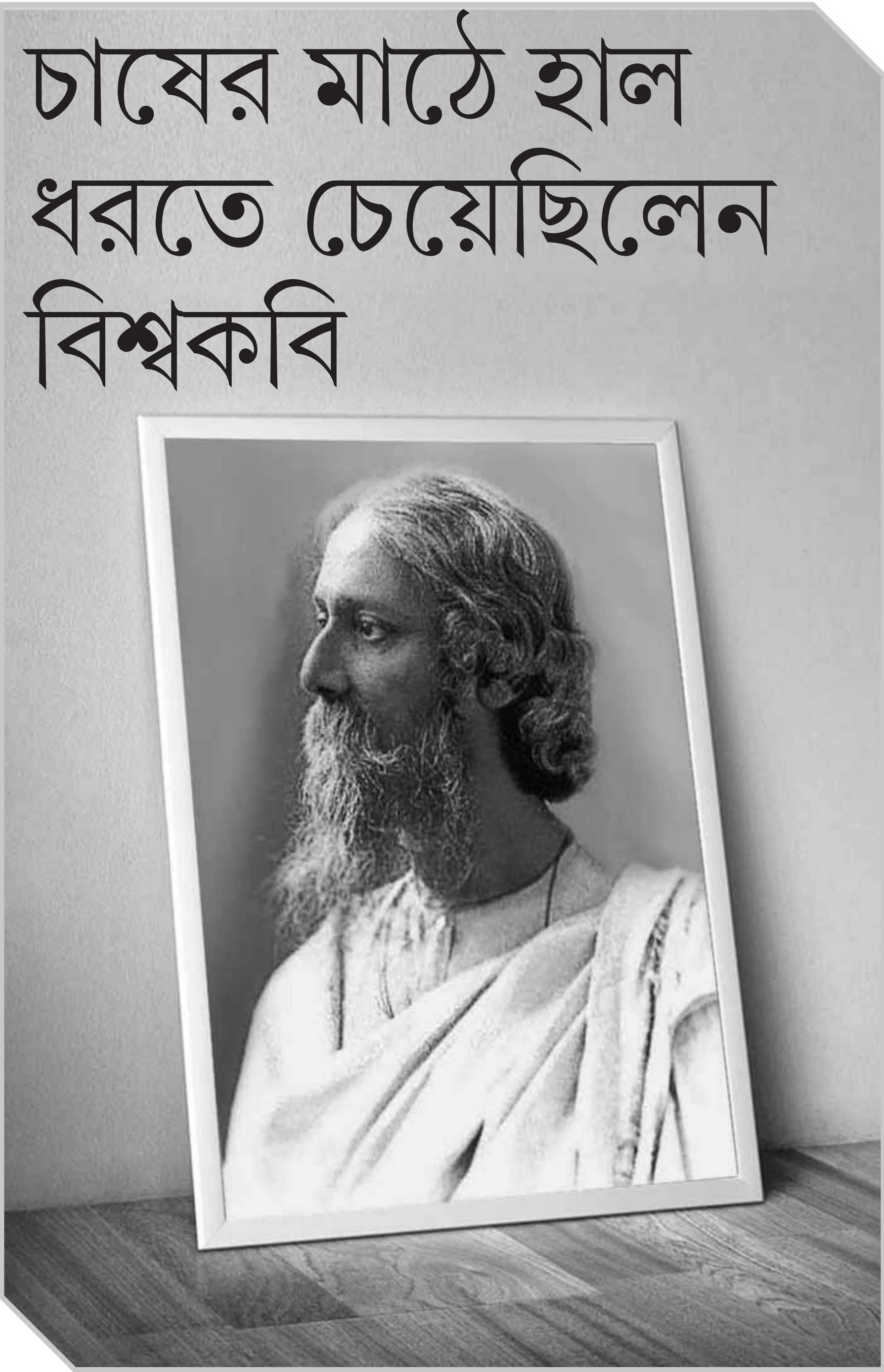

রবি ঠাকুর রয়ে গেলেন মনোজ্ঞ মঞ্চেই !

‘পরাধীন ভারতে তাঁর ভাগ্যে ‘নাইট’ ‘নোবেল’ ইত্যাদি জুটলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসবার পরে তিনি ‘বুর্জোয়া কবি’ উপাধি পেয়েছিলেন। অবশ্য কমিউনিস্টদের পাল্টি খেতে বেশি সময় লাগেনি, তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছিল বেশ ঘটা করেই। ‘নাইট’ তিনি ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজ সরকারের পুলিশের গুলিতে গণহত্যার পরে, আর তাঁর ‘নোবেল’ হাপিশ হয়ে যায় কমিউনিস্ট সরকারের পুলিশের নাকের ডগায়। সেই কমিউনিস্ট শাসন খতম হওয়ার পর বিজয় মিছিলের বদলে পাড়ায় পাড়ায় এবং তার পরে মহানগরীর ট্রাফিক সিগনালে তাঁর গান বাজানোয় অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এখন প্রতি পঁচিশে বৈশাখে স্কুলে ক্লাবে মহল্লায় হনুমান-জয়ন্তী বা গণেশ-চতুর্থীর মতই মহা ধূমধামে তাঁর গান বাজিয়ে তাঁর পুজো হয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যাংক আদালত ছুটি থাকে। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন, স্কুল কলেজের বাংলা বইয়ে সেসব কবিতা পড়ানো হয়। শহরের যানজট ভাল লাগত না বলেই বোধহয় তিনি কলকাতা থেকে খানিক দূরে শান্তিনিকেতন নামে একটি গ্রামে গিয়ে থাকতেন। সেখানে পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ও বানিয়েছিলেন এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার পড়াশোনা করতে এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও। শান্তিনিকেতন এখন উইকএন্ডে বেড়াতে যাওয়ার একটি জনপ্রিয় স্থান।’

বছর কয়েক আগে একটি সরকারি চাকুরির লিখিত পরীক্ষায় এরকমই একটি উত্তরপত্রের হদিশ মিলেছিল। তারপর ইন্টারনেটে এক ইংরাজি ব্লগেও। উভয় ক্ষেত্রেই রচনার বিষয়, বলাই বাহুল্য, বঙ্গ জীবনে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হাজার হাজার

রবীন্দ্রপ্রেমীর মরমে এ হেন রচনা গভীর ব্যথার সৃষ্টি করবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এটিই কঠিন বাস্তব, আম বাঙালির মনে 'রবি ঠাকুর' বলতে ব্যস এইটুকুই রয়ে গিয়েছে। ঘোর নিন্দুক বলে, রবীন্দ্র-অনুরাগী ভদ্দরনোকেরাই নাকি রবি ঠাকুরকে বগলদাবা করে রেখেছে আজও, পৌঁছতে দেয়নি নীচুতলার জনগণের কাছে। মঞ্চে লালপেড়ে শাড়ি পড়ে 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গা মাটির পথ' নেচেকুঁদে গাইলেও, কখনও গাঁয়ের চাষাভুষোর মাঝে ছাড়া হয়নি তাঁকে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, রবি ঠাকুর নামের এই ভদ্রলোক তাঁর জীবদ্দশায় আগাগোড়াই বলে গিয়েছেন ও ভেবে গিয়েছেন সেই গাঁয়ের কথাই। গ্রামের বিকাশই মানব জাতির উত্তরণের একমাত্র পথ, একথা বারবার মিলেছে তাঁর ভাবনায়, চেতনায়, উদ্যোগে। এবং তা অন্তত চে গুয়েভারা কিংবা মাও জে দং-এর অনেক আগেই। কিন্তু কোন সে গূঢ় চক্রান্তে গায়ক-গবেষকদের চৌহদ্দি থেকে কিছুতেই বের করা গেল না তাঁকে, নয়া প্রজন্মের কাছে এটাই হোক পরম বিস্ময়কর খোঁজ।

অথচ খোদ মহানগরে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের শুরুতে গ্রাম নিয়ে কোনও স্বচ্ছ ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিলই না বলা চলে। বরং বলা যায় পিতার নির্দেশে জমিদারি পরিচালনার জন্য পূর্ববঙ্গে কাটাবার ফলেই বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। সেসময় যে গ্রামীণ জীবনকে তিনি দেখেছেন পরবর্তীকালে তাই গ্রাম উন্নয়ন ভাবনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী বিষয়ক চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রথম তাত্ত্বিক রূপ পেল ১৯০৪ সালে লেখা স্বদেশি সমাজ, পরবর্তীতে লেখা পল্লী প্রকৃতি প্রবন্ধে। ১৯০৭ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন। যে তিনটি বিষয়ের ওপরে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল —গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং গণসমাজের মধ্যে গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করা।

কিন্তু রবি ঠাকুর কেবল লেখালেখি বা বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি তাঁর ভাবনাকে। তাঁর পরপর কয়েকটি উদ্যোগের কথা শুনলেই নড়েচড়ে বসবেন আজকের প্রজন্মের স্বল্পবিদ্যাসম্পন্ন কোনও ছাত্র বা যুব নেতা, দেখবেন দেশের বা রাজ্যের সব বাঘা নেতারা যেসব জনমোহিনী ভাবনার উদঘাটন করে ভোটব্যাংক সুরক্ষিত করেন সেগুলি ওই দাড়িওয়ালা বুড়ো কবি ১০০ বছর আগেই ভেবে তাঁর বাস্তব প্রয়োগ করে ফেলেছেন! কী সাংঘাতিক, তাই না!

১৮৯৫ সাল। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হয় 'টেগোর অ্যান্ড কোং'। এই ঠাকুর-কোম্পানি ন্যায্য মূল্যে চাষীদের ধান ও পাট কিনে বাজারে বিপণনের দায়িত্ব নেয়। সরাসরি বিপণনে অক্ষম প্রাথমিক উৎপাদকদের ন্যায়সঙ্গত পণ্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থাস্বরূপ এটা ছিল একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ। এক্ষেত্রেও জমিদার রবীন্দ্রনাথই আবির্ভূত হলেন তাঁর চাষা-ভুষো প্রজাদের আয় বাড়ানোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপকরূপে।

১৯০৫ সাল। পতিসরে প্রতিষ্ঠা করেন কালীগ্রাম কৃষি ব্যাংক। চাষীদের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। রবীন্দ্রনাথের এই কৃষি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি অসাধারণ চিন্তা। কৃষকদের মধ্যে এই ব্যাংক এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাদের ঋণের চাহিদা মেটানো স্বল্পশক্তির এ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমস্যার সমাধান কিছুটা ঘটে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের টাকা কৃষি ব্যাংককে জমা হওয়ার পর। টাকার পরিমাণ যাই হোক মূলধন পেয়ে ব্যাংক সচ্ছল হয়ে ওঠে। কৃষি ব্যাংকের প্রভাব কালীগ্রাম পরগনায় এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে সেখান থেকে মহাজনদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংক চলেছিল কুড়ি বছর ধরে।

১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখাতে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিয়ে দেওয়ার পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকেও তিনি বিদেশে পাঠান কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য। যে-যুগে সন্তানদের আইসিএস বা ব্যারিস্টার বানানো ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে-সময় জনৈক ধনী জমিদারের পুত্র, জামাতা ও বন্ধুপুত্রকে চাষাবাদ শিখতে বিদেশ পাঠানোর মতো সিদ্ধান্ত ছিল রীতিমত বিপ্লবী ভাবনা।

কবির পল্লী উন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনে চিন্তা তখনকার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সাড়া জাগাতে পারেনি, কারণ রাজনীতির গোড়ার কথাই হল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ক্ষমতার রাশ রেখে গাঁয়ের মানুষকে ক্রমাগত ঠকিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি ও ধনরাশির দখল। যে ট্র্যাডিশন পৃথিবী জুড়ে আজও চলছে। তবে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর নিজস্ব আওতায়, ক্রমে তিনি তার বিস্তার ঘটাতে থাকেন।

১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথরা বিদেশ থেকে ফিরে কবির তত্ত্বাবধানে শুরু করেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার, বীজ, সেচ ইত্যাদির ব্যবহার। পল্লীর উন্নয়নের জন্য, কৃষকের জন্য, কৃষকের উন্নয়নে আধুনিক চাষাবাদ প্রবর্তনের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তারই একটা স্বারক পতিসরে ট্রাক্টরের ফলক। পতিসরের প্রথম ট্রাক্টরটি চালিয়েছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। আজ যে-পন্থায় সারা উপমহাদেশে চাষবাস করা হয় সে-প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন ১০০ বছর আগে। পতিসরে কবি একটি ধর্মগোলাও বসান, সেখানে এবং শিলাইদহে স্থাপন করেন আদর্শ কৃষিক্ষেত্র যেখানে সুদূর অতীতের সেই ১৯১০ সালেই ব্যবহৃত হয় ট্রাক্টর, পাম্পসেট আর জৈব সার এবং চাষ হয় তখনকার উচ্চফলনশীল ফসল। নৌকো বোঝাই নষ্ট ইলিশ সস্তায় কিনে তাতে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে তৈরি হয় এই জৈবসার। অধিক ফলনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষি ল্যাবরেটরি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এক চিঠি পড়লে রীতিমত অবাক হতে হয় 'প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।'

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে চালু হয় সুদূর ভবিষ্যৎমুখী সেই আধুনিক কৃষি খামার। আর সেই খামারের আদলেই গড়ে উঠবে আরও সব সমবায়ী খামার, এবং সেগুলিই বাঁচিয়ে রাখবে একে অপরকে, এমনটাই ছিল কবির ভাবনা। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন— "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"

কিন্তু কবির পল্লী উন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনে চিন্তা তখনকার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সাড়া জাগাতে পারেনি, কারণ রাজনীতির গোড়ার কথাই হল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ক্ষমতার রাশ রেখে গাঁয়ের মানুষকে ক্রমাগত ঠকিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি ও ধনরাশির দখল। যে ট্র্যাডিশন পৃথিবী জুড়ে আজও চলছে। তবে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর নিজস্ব আওতায়, ক্রমে তিনি তার বিস্তার ঘটাতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের যেসব কাজে অংশ নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল প্রাথমিক জনশিক্ষাসহ শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তার, চিকিৎসা দান, পূর্তকর্ম যেমন কূপ খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা-পুকুর সংস্কার ইত্যাদি, ঋণদায় থেকে কৃষকদের রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ সালিশ-বিচার। তাই দেখা যায় দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করা তথা জনশিক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছোটদের জন্য দিনে এবং বয়স্কদের জন্য রাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল।

গ্রামের লোকদের নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারে খরচ করার সামর্থ্য ছিল না। সেজন্য গ্রামের মানুষ সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেল। পতিসরে গঠিত হল হিতৈষী সভা। সমিতির সদস্যদের অর্থে একজন কম্পাউন্ডার রাখা হল এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, সমবায় প্রথার মধ্যে দিয়ে বড় পুঁজি এককভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। তিনি চাষীকে সমবায়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সমবায় ব্যাংকের সাহায্যে চাষীর ঋণভার কমাতে বা মোচন করার দিকে নজর দিয়েছেন।

পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ চালু করেন হিতৈষীবৃত্তি ও কল্যাণবৃত্তি। সেই বাবদ সংগৃহীত সব টাকাই ব্যয় হত জমি ও প্রজার উন্নয়নে। প্রজাদের কাছ থেকে হাল-বকেয়া খাজনার টাকা-প্রতি তিন পয়সা

হিসাবে হিতৈষীবৃত্তি আদায় হত। জমিদারি সেরেস্তা থেকে মোট সংগৃহীত টাকার সমপরিমাণ দেওয়া হত, পরবর্তীকালের সরকারি 'বেনিভোলেন্ট ফান্ড' বা হিতৈষী তহবিলের 'ইকুইটি গ্রান্ট' হিসেবে। সেই টাকা খরচের ব্যবস্থা করত প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হিতৈষী সভা।

কল্যাণবৃত্তিও টাকায় তিন পয়সা। তার জন্যে আলাদা রসিদও দেওয়া হত এবং আদায়ের সমপরিমাণ টাকা দিতেন জমিদার নিজে। এইভাবে বছরে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা সংগৃহীত হত। তাছাড়া সায়রাত-মহাল বন্দোবস্ত হলে মোট নজরের শতকরা আড়াই টাকা ও নামখারিজের নজরানা সরকারি আইনে শতকরা পাঁচ টাকা আদায় হত। এই টাকাই ব্যয় হয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণে, মন্দির-মসজিদ সংস্কারে, স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপনে আর চাষীদের বিপদ-আপদের সাহায্যে।

শিলাইদহে স্থাপিত হয় মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। পতিসরে বসানো হয় বড় হাসপাতাল এবং কালীগ্রাম পরগণার তিনটি বিভাগে নিয়োজিত হন তিন জন ডাক্তার। 'হেলথ কোঅপারেটিভ'-এর মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম চালু করেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নিজ জমিদারিতে।

এই প্রজাহিতৈষী জমিদার কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা তৈরি করিয়ে দেন এই শর্তে যে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে স্থানীয় গ্রামবাসী। কুয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব দেন গ্রামবাসীকে আর তিনি দায়িত্ব নেন এস্টেট থেকে কুয়ো বাঁধানোর। পুকুর সংস্কারও চলে একই রীতিনীতিতে। রবীন্দ্রনাথের অংশীদারি-ভিত্তিক উন্নয়নের কার্যকর এই নীতিটিকে তাঁর স্বকালে কেউ আমলে নেয়নি। কিন্তু একই জিনিস 'পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট ফরমুলা' নামে বিদেশী সীলমোহর পাওয়ামাত্রই তার ওপর পিএইচডি-র জন্যে দলে দলে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এদেশের মেধাবীগণও।

কুটীর শিল্পের উন্নয়নেও হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হল একজন তাঁতিকে। স্থানীয় একজন জোলাকে পাঠানো হল শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খুললেন তাঁতের স্কুল। পটারির কাজেও হাত দেওয়া হল একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন —"বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে, সেই রকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।এখানকার চাষীদের কোন industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industry-রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস ছোটখাট furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র (রবীন্দ্রনাথের শ্যালক) বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না; খোলা পেলে সুবিধা হয়।"

প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা তাঁদের ভিতর থেকে

"আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দু'টি ছোট গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দু'টি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে।"

একজনকে প্রধান মনোনীত করতেন। ওই গ্রামপ্রধানরাই পরে আবার পরগণার সব প্রধানদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে মনোনীত করতেন। তাঁদের বলা হত পঞ্চপ্রধান। বিবাদ ও বিরোধ পঞ্চপ্রধানরাই মিটিয়ে দিতেন। শেষ আপীল রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনও পক্ষ আদালতে নালিশ করলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই বিচার ব্যবস্থায় মামলার কোনও খরচ লাগত না, বিচারে বিলম্বও হত না। এই ব্যবস্থা কালীগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরেও দেশবিভাগ পর্যন্ত চালু ছিল। অতএব দেখা যায় যে গ্রামপঞ্চায়েত প্রথা

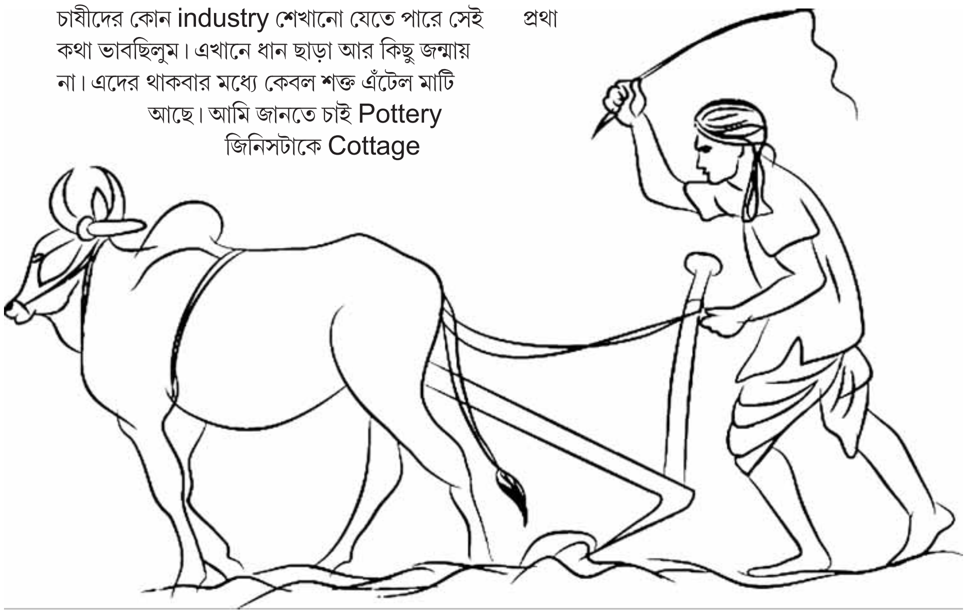

প্রবর্তনেরও পূর্বসূরি সমাজতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথই। রাজনৈতিক নেতা ফজলুল হক কিংবা জ্যোতি বসু তাঁর দূরবর্তী ও সুদূরবর্তী উত্তরসূরিমাত্র।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহও তাঁর কর্ম জীবনের সেই আদি যুগের। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, গ্রামকে বাঁচাতে হলে 'সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই।' ঐকত্রিক চাষ সম্বন্ধেও পথিকৃতের অবদান রবীন্দ্রনাথের, যিনি পতিসরে সেই ১৯০৫ সালেই কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন সমবায়নীতি বাস্তবায়নকল্পে। তিনি দেখলেন, মহাজনদের কাছ থেকে চাষীদের মুক্ত করতে না পারলে দেশের দুর্গতি দূর হবে না। কৃষি বা কুটিরশিল্পের জন্য যে মূলধন দরকার তা তারা কোনওদিনই সংগ্রহ করতে পারবে না। এখানেও সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ, নোবেলজয়ী ডক্টর ইউনুস আট দশক পরের উত্তরসূরি।

"আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দু'টি ছোট গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দু'টি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে।"

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল বোলপুর শান্তিনিকেতনে। পরের বছর পাশেই এর পরিপূরক প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনের সৃষ্টি। পল্লী-সংগঠনের অনেক পরিকল্পনা পতিসর থেকে স্থানান্তরিত হল শ্রীনিকেতনে। এল্মহার্স্ট সাহেব ও কালীমোহন ঘোষ নিলেন তার ভার। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষবার যান শিলাইদহে। সে বছরই বোলপুরে শুরু হয় শ্রীনিকেতনের নতুন কর্মযজ্ঞ। এসব কথা সবারই জানা। কিন্তু আজ জানলে অবাক হতে হয়, এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেছিলেন অনেক আগেই।

রবীন্দ্রনাথের কৃষকের জন্য ভাবনার দ্বিতীয় পর্যায় বোলপুরের শ্রীনিকেতনে। কৃষিবিদ লিওনার্ড এলমহার্স্টের সক্রিয়তায় এবং অর্থানুকূল্যে সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িটি সিংহ পরিবারের থেকে কিনে কৃষি গবেষণার কাজ শুরু হয় ১৯১৪-তে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে হস্তকারুশিল্প

গড়ে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯২২ থেকে শিল্পভবন কার্যকরী ভূমিকা নেয়। চামড়া, সূঁচ, মাটি ও গালার কাজ, শতরঞ্চি বুনন, ব্লক ছাপা যন্ত্র চলতে থাকে। বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কালীমোহন ঘোষ আদিবাসী কল্যাণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সালিশী বিচারে বিবাদ মেটানোতে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কেঁদুলি, কঙ্কালিতলা ও অন্য মেলায় ব্রতী বালকদল নিয়ে গিয়ে মদ, তাড়ি, জুয়া ও দুর্নীতি নিবারণে, মেলাক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় বড়সড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দায়িত্ব তুলে নেন আমেরিকান সমাজসেবিকা গ্রেচেন গ্রীন। ১৯২৬ সালে তাঁরই চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২৭-তে প্রতিষ্ঠা হল সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। তার আগেই স্থানীয় উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল পল্লীউন্নয়ন সমিতি, সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি, ধর্মগোলা, কৃষিঋণদান সমিতি, সেচ সমবায় এবং সমবায় বয়ন সমিতি। ১৯২৭ সালেই স্থাপিত হয় পল্লী-সংগঠন বিভাগ লাইব্রেরি, যাতে কৃষি ও গোপালন, হস্ত ও কুটির শিল্প, বিদ্যালয়-পাঠ্য এবং রেফারেন্স বইপত্র থাকে।

শ্রীনিকেতন-কেন্দ্রিক কর্মযজ্ঞের যে তালিকা মেলে তা যথেষ্ট লম্বা। ছাত্রদের নিয়ে উন্নত ধরনের কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা, গ্রাম্য যুবকদের ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণাগারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উপকরণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থার সমস্যা উদ্ঘাটন ও সমাধান প্রয়াস, প্রয়োজনীয় ও পরিচিত ফসল ছাড়া বিভিন্ন ফসলের চাষ, উন্নত ধরনের বীজ, ফলের চারা, উন্নতমানের পশু চাষীদের মধ্যে বিতরণ ও উৎপাদনে উৎসাহ, আবহাওয়া ও মাটির সঙ্গে মানিয়ে নানা ফসল চাষ, প্রয়োজনীয় জলসেচ ও সুচারু পয়প্রণালী বিন্যাস, ট্রাক্টর ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, উন্নত মানের জৈবসার তৈরি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে গোখাদ্য চাষ, উন্নত মানের গরু, ছাগল, মৌমাছি, মাছের চাষ, উৎপন্ন পণ্যের বাজার দর যাচাই ইত্যাদি ইত্যাদির।

কিন্তু শ্রীনিকেতন মডেল জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়নি নানাবিধ কারণে। ঘি হজম হয়নি বাংলার কৃষকদের। শ্রীনিকেতন প্রকল্পকে সাদরে বরণ করে নেওয়ায় বাধা দিয়েছে। আর সরকারের ভূমিকার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয় বইকি। স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় এল জাতীয়তাবাদী দল। কিন্তু তাঁদের নিজেদের ভাবনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই হোক বা নিজেদের ভাবনার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বার ভয়েই হোক, কিংবা উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা কৃষকের স্বার্থের চাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই হোক, রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-ভাবনা আরও একবার জলে গেল। তারপর এ নিয়ে পৃথিবী জুড়ে গবেষণা হল, আলোড়নও উঠেছে। কিন্তু রাজনীতির বিষ পোকারা ছড়িয়ে যেতে লাগল জাতির অলিন্দে প্রকোষ্ঠে, আর ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকল গুরুদেবের শান্তিনিকেতন। মধ্যবিত্ত বাঙালি রবিঠাকুরকে এনে বসাল সংস্কৃতির মনোজ্ঞ মঞ্চে।

"রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কবি নন, একজন কবি দিনভর ভাবের ঘোরেই থাকেন, বাস্তবের মাটিতে নেমে আসবার তাঁর সময় কোথায়?" এরকম অজস্র অপবাদ তাঁকে শুনতে হয়েছে বারবার, নিজের জীবদ্দশায়, মৃত্যুর বহু পরে বাংলার মাটিতে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকেরা ক্ষমতায় আসবার পরেও। মহামূর্খ বাঙালির বদান্যতায় বারবার জখম হয়েছে মানুষটির আত্মা। আসলে তিনি আগাগোড়াই ভয় পেয়ে এসেছেন আমাদের মতো 'রবীন্দ্র-অনুরাগী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের'কে, বুঝতে পেরেছেন সংখ্যায় এরা যত বাড়বে ততই কাল ঘনিয়ে আসবে সমাজের। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ-কাজের যোগ্য।"

রবীন্দ্রনাথের মতে "গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখানে থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষা লাভ করা চাই।" অর্থাৎ এদের থেকে আগে শিক্ষা নেওয়া চাই। প্রসঙ্গত বলা যায় সমাজতত্ত্বের মৌল সত্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ভাষায় প্রকাশ করার পরে বাস্তবেও প্রমাণ করেছেন বিশ শতকের শুরুতে। সেসব এড়িয়ে গিয়ে আমরা কেবল তাঁর কাব্য পড়েছি আর গান গেয়েছি।

একশ বছর আগে যে বাঙালি কবি লেখালেখির জগতের বাইরে বেরিয়ে এসে মাঠের চাষাদের হাল ধরতে চেয়েছিলেন, কৃষিসর্বস্ব বাংলাদেশে কৃষকের কল্যাণের কথা ভেবে ভেবে তা হাতে কলমে প্রয়োগ করে দেখেছিলেন, কৃষি বা সমাজবিজ্ঞানের কোনও পাঠ না থাকলেও চালু করেছিলেন সব প্রথা যা আজ বিশ্বজুড়ে চর্চিত-বন্দিত হচ্ছে, সেসব নিয়ে আমাদের কৃষকের নতুন প্রজন্ম, আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা কিছুই জানবে না? গাঁয়ের শিশুরা, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ি কেউই জানতে পারল না, রবি ঠাকুরই আসলে তাদের প্রাণের ঠাকুর! তাঁকে আমরা ভদ্দরনোকেরা বেঁধে রাখলাম বাসস্টপে? জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মিউজিয়ামে? গীতি-আলেখ্য আর নৃত্য-নাট্যের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক মঞ্চে? হাজার হাজার পাতার গবেষণা গ্রন্থে? অনুপ্রেরণার কথাই যদি বলি তবে আসলে সেসব কার?

জনৈক বিদ্বান মানুষের কথাই আজকাল ভীষণ সত্যি বোধ হয় —ধ্বংসের পথে চলেছে যে মূঢ় জাতি তাঁর কাছ থেকে আর কীই বা প্রত্যাশা করা যায়?

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার বাংলাদেশের গবেষক ও প্রাবন্ধিকদের প্রতি)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

নির্বাসিত নজরুল

আজকের শিশুরা কিন্তু জেনারেল নলেজ নিয়ে যথেষ্ট সিরিয়াস, সুতরাং আপনি কাজি নজরুল ইসলামের নাম বললে ওরা চিনতে পারবে না এমনটি ভাববার কোনও কারণ নেই। প্রধান শিক্ষিকার গলায় প্রত্যয়ের সুর যদিও খানিকটা ধাক্কা খায় যখন জিজ্ঞেস করা হল, নজরুলের 'লিচুচোর' কবিতাটি ক্লাসের ক'জন বাচ্চা আবৃত্তি করতে পারবে কিংবা 'মোমের পুতুল' গানটি ক'জন গাইতে পারবে? তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি, এতে শিশুদের ত্রুটি নেই কোনও! আমাদের আজকের প্রশ্নের পরিধিটা আরও অনেক বড়— আমাদের সবার অলক্ষ্যে এপার বাংলায় নজরুল চর্চায় ভাঁটা পড়ল কেন? ঠিক কী কী কারণে আজকাল পাড়ার ক্লাবে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে? বাসস্টপের দেওয়ালের ভিনাইলে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' মার্কা কয়েকটি পরিচিত লাইন ছাড়া নজরুলকে আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় আজ? নজরুলের মতো বলিষ্ঠ, আপসহীন, উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমিক, মানবতাবাদী নায়কের বড় প্রয়োজন ছিল না আজ? প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরাজি বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠতি মধ্যবিত্তের পয়সা পকেটস্থ করার অভিপ্রায়ে বাজারে ছেয়ে গেল মন্টেসরি-কনভেন্ট— এক নজর দেখলেই টের পাওয়া যায় কোনও গভীর সুপরিকল্পিত অভিসন্ধির গোপন ঘ্রাণ। ঠিক তেমনই নতুন প্রজন্মের আওতা থেকে নজরুল ইসলামকে বাইরে রেখে দেওয়ার এই অভিপ্রায়ও কি সেরকমই কোনও দুরভিসন্ধি মনে হয় না?

যদি সত্যি তাই হয়, তবে সেই মাফিয়াদের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা আমাদের মতো সংখ্যায়-অতি-লঘু কলমজীবী সম্প্রদায়ের নেই। অথচ আমরা বিলক্ষণ টের পাই আমাদের চারপাশে কেবল মধ্যমেধার আস্ফালন, আমাদের উত্তরপুরুষের সামনে নেই অনুসরণযোগ্য, অনুকরণযোগ্য কোনও 'রোল মডেল'! আসলে বড়কে, মহৎকে, উত্তমকে যদি হৃদ্‌মাঝারে গ্রহণ, উপলব্ধি ও লালন করতে না পারি তবে আমাদের চিন্তন ও মননের ক্ষেত্রটি নিতান্ত অনুর্বরই থেকে যায়। দীর্ঘকাল পতিত 'মানবজমিন'-এ সোনার ফসলের সম্ভাবনা তখন নিতান্ত অলীক হয়ে দাঁড়ায়! তাই এইবেলা যেটুকু না করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের একেবারেই মাফ করবে না সেটুকু অন্তত করে যাই। পরবর্তী প্রজন্মের সামনে আলোকময় মানুষ হিসেবে নজরুলকে নিয়ে আসার দায় আমাদেরই। যদি সুকৌশলে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে একালের চতুর শাসকেরা নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেও ফেলেন, আমাদের কাজ হবে তাঁর রচনাসমূহের উজ্জ্বল উদ্ধার ও আন্তরিক চর্চা।

নজরুল এক দুঃসাহসিক নির্মাণ

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে; অতি দরিদ্র পরিবারে। নিয়মিত পাঠগ্রহণ বা উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয়নি তাঁর। মাত্র ২২-২৩ বছর ছিল তাঁর লেখালেখির জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি রচনা করেন প্রায় আড়াই হাজার গান, আটশো কবিতা, তিনটি উপন্যাস, আঠেরো-উনিশটি গল্প, প্রায় তিরিশটি নাটক-নাট্যবিচিত্রা, একশোর মতো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনা-অভিভাষণ। শব্দ চয়নে, ছন্দের কারুকাজে, স্তবক নির্মাণের কুশলতায়, আরবি-ফারসি শব্দের অতি সুচারু ব্যবহারে, পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রের অনায়াস প্রতীকী ব্যবহারে এক অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক ও ভাষাশিল্পীকে পেয়ে যাই আমরা। ভারি কৌতূহল জাগে— যিনি স্কুলের গণ্ডি পেরোলেন না, তাঁর রচনায় ও ভাষা প্রয়োগে এমন বিষয়ের ব্যাপকতা, অনুভবের অনন্যতা, শব্দের অমোঘ প্রয়োগ দক্ষতা সেই সময়ে ঠিক কী করে সম্ভব হল?

প্রথমেই তাকাতে হয় তার বাল্যজীবনের দিকে। তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতি ছিল বিদ্যা শিক্ষার প্রথম উৎস। তাঁর বাবা ফকির আহমদ গরীব ছিলেন কিন্তু শ্রমজীবী ছিলেন না। সামাজিক অবস্থানেও খুব নিম্নবর্গীয় ছিলেন না। কাজী বংশের মানুষেরা মধ্যযুগীয় বাদশাহদের বিচারবিভাগে কাজ করতেন। যদিও ব্রিটিশ আমলে সেই ব্যবস্থা ও পদ লুপ্ত হয়ে যায়। নজরুলের পূর্বপুরুষেরা ভূ-সম্পত্তি অর্জন করে পাটনা থেকে চুরুলিয়া এসে বসবাস করেন ও কাজীর জীবিকাই নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ধর্মীয় কাজ করতেন। তাঁদের পরিবারে ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও সাহিত্য পাঠের প্রচলন ছিল। ফকির আহমেদ স্থানীয় মাজার-মসজিদ দেখাশোনা করতেন, ফারসি ও উর্দু জানতেন কিন্তু ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর

মধ্যে ছিল না এমনটাই শোনা যায়। শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তেমন ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেখাও যায় না! নজরুলের জীবনদর্শনে এই অসাম্প্রদায়িকতার বীজটি সেই বাল্যকালেই প্রোথিত হয়েছিল মনে হয়। জন্মসূত্রেই তিনি ফারসি, উর্দু ও বাংলা এই তিনটি ভাষার উত্তরাধিকার অর্জন করেন, স্কুলে গিয়ে শিখলেন ইংরেজি ভাষা।

সেই শৈশবকাল থেকেই প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই তাঁর। মাত্র ন' বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। ঘরে অভাব, পড়বেন কীভাবে? যেখানে পড়তেন সেখানকার ছোটছোট বাচ্চাদের পড়াতে শুরু করলেন বালক নজরুল। এরপরে বিভিন্ন সময়ে স্কুলে ভরতি হলেও একটানা পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তবে আসল শিক্ষার শুরু সম্ভবত লেটোর দলে গান গাইতে গিয়ে। নজরুলের এক কাকা কাজী বজলে করিম ছিলেন এক লেটোর দলের অধিকারী; তিনি আরবি-ফারসি জানতেন, কাব্যচর্চা করতেন। বালক নজরুলকেও কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করতেন। এই লেটোর দলে নজরুলও যুক্ত হয়েছিলেন। রাঢ় বাংলার কয়েকটি জেলায় এই লোকায়ত নাটপালা গীতি অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল। দু' দলের উক্তি-প্রত্যুক্তির আঙ্গিকে এই গান পরিবেশিত হত। লোক-মনোরঞ্জনই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তুতে থাকত সামাজিক হাস্যকৌতুক ও সেই সঙ্গে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্যের নানা প্রসঙ্গ। লেটো শিল্পীকে আসরে দাঁড়িয়েই কথা ও সুরের সম্মেলনে বিবিধ প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হত। জানতে হত নানান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও। সুতরাং সুদক্ষ লেটো শিল্পী নজরুলের পুরাণাদি সাহিত্য যথেষ্ট পড়াশুনো ছিল বোঝাই যায়। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে নয়; পুরাণ, কোরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাস তিনি পাঠ করেছিলেন সাহিত্য রসাস্বাদনের আকাঙ্খায় ও তার শৈল্পিক ব্যবহার অভীপ্সায়। লেটো শিল্পী থাকা কালে নজরুল রচিত কয়েকটি পালার সন্ধানও পেয়েছেন গবেষকরা— তাদের কয়েকটি হল শকুনিবধ, মেঘনাদবধ, যুধিষ্ঠির, কবি কালিদাস, আকবর বাদশা ইত্যাদি।

এই পাঠ ও তার গভীর অনুভব পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে নজরুলের বিভিন্ন কবিতায়। তাঁর বহুল জনপ্রিয় বিদ্রোহী কবিতাটিতে এই সত্য প্রকাশিত, বিবিধ ছন্দের অপরূপ ব্যবহারে বিষয়ের বৈচিত্রে তিনি রসানুগ্রাহী পাঠককে সঙ্গে নিয়ে যেন এক নবতর অভিযাত্রায় বের হয়েছেন। বাংলা কাব্য জগতে এ এক অভিনব নির্মাণ। এমন জোরালো ও সংবেদনশীল ভাষা, এমন প্রচলিত যাপনের কূপমণ্ডুকতায় সদম্ভ ধাক্কা— 'বোতাম আঁটা জামার নিচে' শায়িত শান্ত বাঙালি হৃদয়ে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস এনেছিল— এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্রোহী কবিতার ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বমিত্র, বাসুকি নাগ, স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল— কী অনায়াস দক্ষতায় কবি বিচরণ করেন আমাদের ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য সমূহের জগতে। নিবিষ্ট পঠন ছাড়া এ সৃষ্টি কি সম্ভব?

নজরুলের জীবনে দ্বিতীয়বার স্কুলে ভরতি হবার সুযোগ এল ১৯১৪ সালে। কাজী রফিজউল্লাও নামে পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর একান্ত স্নেহের বশে এই প্রতিভাবান কিশোরটিকে ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভরতি করে দেন। সপ্তম শ্রেণিতে ভরতি হলেন নজরুল, যদিও বেশি দিনের জন্য নয়। তবু সম্ভবত এই স্কুলেই তাঁর ভাষা শিক্ষার ভিতটি সঠিকভাবে গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক বাংলা সাহিত্যও বিধিবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। জীবিকার জন্য

নজরুল প্রকৃতই জনগণেরই লেখক, তাঁদের হয়েই কলম ধরেছেন। সে কলম তরবারির মতোই তীক্ষ্ণ ও ধারালো। দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেমই তাঁকে দান করেছে মহাশক্তি! যে শক্তিকে চিরকালের ভয় প্রশাসনের। এই শক্তি জোটবদ্ধ হলে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ধ্বস নামাতে পারে ক্ষমতার পাথুরে দেওয়ালে। শাসক তা পছন্দ করবে কেন? পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালেই কোনও শাসক বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেনি, কোনওদিন করবেও না।

ইতিমধ্যে তাকে ছোট-বড় বাছ বিচার না করেই অনেক ধরনের কাজই করতে হয়েছে; যেমন রেলওয়ে গার্ড সাহেবের বাসায় চাকরি, আসানলোলের এক রুটি কারখানায় চাকরি ইত্যাদিও করেছেন।

এরপর ১৯১৬-র ফেব্রুয়ারিতে ভরতি হলেন শিয়ারসোল রাজ স্কুলে। মেধাবী ছাত্র বলে থাকা-খাওয়া ফ্রি, উপরন্তু সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। থাকতেন হোস্টেলে। এখানেই তাঁর বন্ধুত্ব হয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ও সহপাঠী শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে, যিনি ধর্মে খ্রিস্টান। তিন ধর্মের তিন বন্ধুর মনের ধর্মীয় সংকীর্ণতার চিহ্নও ছিল না। স্কুলের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। শিক্ষকরা, ক্লাসের প্রথম স্থানাধিকারী নজরুলকে স্নেহ করতেন উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীকালে শৈলজানন্দের নানা 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায়, সে সময়ে নজরুল পড়ে ফেলেছেন— বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসের কাব্য; জয়দেবের রচনা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকটাই। তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্র অনুরাগী। খুব ভাল করে লিখেছিলেন ইংরেজি, সংস্কৃত ও ফারসি। মনের আনন্দে প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক রচনা করে শিক্ষকদের দেখাতেন।

এই স্কুলের শিক্ষক 'যুগান্তর' দলের সদস্য নিবারণ চন্দ্র ঘটকের মাধ্যমেই নজরুল আকৃষ্ট হলেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি। তাঁর কাছেই সম্ভবত পড়লেন ও জানলেন দেশ-বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস।

১৯১৭ সাল, সামনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, ক্লাসের সেরা ছাত্র নজরুল হঠাৎই ব্রিটিশ বাহিনীর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলি রেজিমেন্টে নাম লিখিয়ে ফৌজে ভরতি হয়ে গেলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। করাচিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁদের। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটি দেওয়া হল না ঠিকই কিন্তু এই সেনা ছাউনিতে নজরুল পেয়ে গেলেন প্রচুর পড়াশুনো করবার সুযোগ। এই সেনা ছাউনিটিতে ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অত্যন্ত অনুকূল এক পরিবেশ, ছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল উপলব্ধি করবার পরিস্থিতি। প্রান্তিক জেলার কিশোর নজরুল ক্রমে আত্মস্থ করে নিলেন বৃহৎ বিশ্বের বিবিধ তরঙ্গগুলি। এখানে পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে নিয়মিত চলল তাঁর আরবি ও ফারসির চর্চা। স্বরলিপি দেখে শিখতেন রবীন্দ্রসংগীত। হাবিলদার নিত্যানন্দ দে-র কাছে অর্গ্যান বাজানো শিখলেন, বিউগল মাস্টার গোপীনাথের কাছে শিখলেন বিউগল বাজাতে। ইতিপূর্বে সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রী সতীশ চন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছে নজরুলের। এই সেনা ছাউনিতে গানবাজনার নিয়মিত আসরের উদ্যোক্তা ছিলেন নজরুল। হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের গজল ও রুবাইগুলি খুব ভালভাবে পাঠ ও আত্মস্থ করেছিলেন এখানেই। পরবর্তীকালে হাফিজ এবং খৈয়ামের স্বাদু অনুবাদ বেরিয়েছে তাঁরই কলম থেকে।

গ্রাহক হিসেবে চাঁদা দিয়েই বেশ ভাল কিছু পত্রপত্রিকা আনানো হত সেই সেনা ছাউনিতে। গোপনে পঠিত হত বিপ্লবীদের পত্রিকা, রাজদ্রোহমূলক নানা রচনা। রুশ বিপ্লব ও আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহের ইতিহাস এখানেই পড়েছেন। বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিষয়েও তাঁর স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সমকালীন পত্রপত্রিকা পাঠে। এরপর এই সেনা ছাউনিতে বসেই নজরুল নিয়মিত লিখে চললেন কবিতা ও গল্প। সেগুলো পাঠাতেন 'নুর', 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় আর নিয়মিত প্রকাশিতও হতে থাকে সেসব লেখা। ১৯১৮য় প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল, নজরুল ফিরলেন কলকাতায়। এই সময় তিনি মুজফফর আহ্‌মেদের নিকট

সংসর্গে এলেন। আরও নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে নৈকট্য স্থাপিত হল তাঁর। লিখতে শুরু করেন উপন্যাস ও কবিতা। সাধনা, বঙ্গবাণী, নারায়ণ, ভারতবর্ষ, বঙ্গনূর, ভারতী, প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী, উপাসনা, বকুল, অঙ্কুর, সহচর ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল নজরুলের রচনা।

জীবিতকালেই বিরুদ্ধতার প্রলয় নেমে এসেছে নজরুলের লেখনির ওপর, ব্যক্তিজীবনের ওপর, সামাজিক অবস্থানের ওপর। কিন্তু ততই প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কবি, পেয়েছে তাঁর রচনাও। নজরুল তাঁর লেখনির মাধ্যমে বিপ্লবের আগুন জ্বালতে চেয়েছিলেন যুবমানসে রক্তসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। কূপমণ্ডুকতার, জড়ত্বের আবরণ খসিয়ে ফেলে জনমানসে প্রবল ঝঞ্ঝার অনুরণন তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর বই একের পর এক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক কবিকে কারাগারে পাঠিয়েছে, সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে কিন্তু তাঁকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তাঁর কবিতা ও গান শাসকের বিষদৃষ্টিতে পরেছে বারবার। তাঁর যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু একের পর এক নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতাটি লেখার জন্য। 'প্রলয়শিখা' বইটির জন্য কবির ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

পরাধীন ভারতের বেদনা ও লাঞ্ছনা কবিকে বেদনাহত করত, দেশপ্রেমিক নজরুল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট ছিলেন বাল্যকাল থেকেই। মার্কর্সবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন মুজফফর আহ্‌মেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে। লোকায়ত সাধারণ মানুষের জীবন ও দারিদ্র্য দেখেছেন, নিজেও জেনেছেন দারিদ্র ও অভাবের কঠিন কঠোর স্বরূপ। সুতরাং তার রচনায় বারবার উঠে এসেছে জনসাধারণের কথা। নজরুল প্রকৃতই জনগণেরই লেখক, তাঁদের হয়েই কলম ধরেছেন। সে কলম তরবারির মতোই তীক্ষ্ণ ও ধারালো। দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেমই তাঁকে দান করেছে মহাশক্তি! যে শক্তিকে চিরকালের ভয় প্রশাসনের। এই শক্তি জোটবদ্ধ হলে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ধ্বস নামাতে পারে ক্ষমতার পাথুরে দেওয়ালে। শাসক তা পছন্দ করবে কেন? পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালেই কোনও শাসক বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেনি, কোনওদিন করবেও না।

গানের নজরুল প্রাণের নজরুল

এই বিরল প্রতিভার কাছে আমাদের নতজানু হতে হয়। পারিবারিক সাংগীতিক পরিমণ্ডল তিনি পাননি; নাড়া বেঁধে গুরু রেখে সংগীত শিক্ষা করবার সংগতি বাল্যে, কৈশোরে বা পরেও তেমনভাবে হয়নি। অথচ বাংলা গানে নিয়ে এলেন নতুন সংগীতের ধারা। সুরের তৃষ্ণা ছিল তাঁর প্রবল— সুর তিনি কুড়িয়েছেন সুরের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কখনও মিশিয়ে নিয়েছেন অপরূপ নৈপুণ্যে নিজের গানে, নতুনভাবে ও ছন্দে— যেমন তুরস্কের লোক সংগীতের সুরে 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্নিবায়', ইজিপসিয়ান সুরে 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়', আরবী সুরে 'রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম/খেজুর পাতায় নূপুর বাজায়', কিউবান সুরে 'দূর দ্বীপ বাসিনী, চিনি তোমারে চিনি...'

অসাধারণ কিছু শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন নজরুল। বিদ্রোহী কবির আত্মবিস্ফোরণ ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল বিনম্র আত্মনিবেদনে। 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'— প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের অকালপ্রয়াণে বিপর্যস্ত কবি আধ্যাত্মিক জগতে সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়েও নজরুলের অন্তরে হিন্দু দেবদেবী বা ধর্মচর্চা বিষয়ে আগ্রহের অভাব ছিল না; সম্পূর্ণ গোঁড়ামি মুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন তিনি। 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'বলরে জবা বল', 'শ্যামা নামের লাগলো আগুন', 'জাগো যোগমায়া', 'শিশু যেমন অনায়াসে জননীরে ভালোবাসে'— এই গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল সেদিন পর্যন্ত। কই সেসব গান আর শোনা যায় না কেন? কেউ গায়ই না বা কেন? ওতে সেকুলারিজমের গন্ধ আছে বলে?

চমৎকার ইসলামী সংগীতও রচনা করেছেন কবি। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এটিও নতুন ধারার সূচনা করল— 'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ', 'ইসলামের ওই সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়', ইত্যাদি অজস্র গান। ঈদের গান, নামাজ-রোজার গান লিখে রাগ-রাগিনীর সুর মেশালেন। প্রায় দুশোর মতো

ইসলামী গান রয়েছে নজরুলের। এই জমানার ক'জন ইসলামী রাখেন সেই খবর?

বাংলায় ভজন, গজল, ঠুংরী, কাওয়ালীর জোয়ার এসেছিল নজরুলের হাতে। যুব জনতাকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। মার্চ পাস্টের গান প্রথম নজরুলের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে। একাধারে গণসংগীত রচনা করেছেন অজস্র— মুটে মজুর জেলের গান, ছাত্রদলের গান, চাষীর গান, ছাদ পেটানোর গান, শিশুদের গান, ঋতু বৈচিত্র মূলক গান, প্যারডি— কী নয়?

নজরুলের লোকসংগীতিতে জল, মাটি, মানুষ আর প্রকৃতির নিবিড় ছোঁয়া, আধ্যাত্মিক সংগীতে পাই মরমী ভক্তি, দেশাত্মবোধক সংগীতে আছে তেজ ও দীপ্তি। গীতিকার নজরুল নিজস্ব অপরূপ সুর ও সংবেদনশীল শব্দের যাদুতে আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন।

প্রতিবাদী নজরুল আসলে 'প্ররোচনামূলক'? নাকি প্ররোচনায় জল ঢালে?

পুরনো ঘরানার এক অশতিপর রাজনৈতিক মানুষ অকপটে স্বীকার করলেন, অধর্মের যুগে ধর্মীয় উন্মাদনার অসাধু ব্যবহার জনচেতনাকে অবশ করে রাখতে পারে, কারণ প্রতিবাদের ভাষাকে উজ্জীবিত রাখতে পছন্দ করেন না কোনও শাসক, এতে শোষণে বিঘ্ন ঘটে। তাই হাজার-লক্ষ যৌবনতরঙ্গকে অবদমিত রাখবার একটি বড় পথই হল মহল্লায় মহল্লায় সুরাপানের বৈধ ঢালাও আয়োজন। হাতে তুলে দাও ভাতা, বুক চিতিয়ে আকণ্ঠ পান করুক ওরা, বাইক নিয়ে দাপাদাপি করুক শাসন করুক মধ্যরাত, তারপর সকাল হবার আগেই নেতিয়ে পড়ুক। এসময় নজরুলের 'বিদ্রোহী-বিপ্লবী মার্কা' কবিতা-গানের চর্চা রীতিমত 'প্ররোচনামূলক' হয়ে উঠতে পারে, তাই না? কোন শাসক চাইবে বলুন তো সেসব 'অশান্তি'?

নজরুলের সমকালীন সমাজ কতটুকু বদলেছে এতদিনে? বলা মুস্কিল! কিন্তু দেশপ্রেমের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে আলবাৎ। এখন দেশপ্রেম একটি জনপ্রিয় পণ্য। দেশপ্রেম মানে তো আজ প্রতিবেশী দেশের নামে জাত তুলে অকথ্য অপপ্রচার! প্রতিবেশীর সীমান্তে হাজারো পর্যটকের সামনে দৈনন্দিন সার্কাস! কোট-টাই পড়ে টিভি চ্যানেলে তারকা-সাংবাদিকের খবর বিক্রির নির্লজ্জ ফিকির! নজরুলের 'সেকেলে' জাতের নামে বজ্জাতি গান সেইসব বহুমূল্যে-সৃষ্ট-উত্তেজনায় পুরো জল ঢেলে দেবে যে!

কী বলছেন? নজরুলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে?

নজরুল কেন এপার বাংলায় ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে গেলেন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলাম নানা স্তরের মানুষের কাছে, খুব একটা জোরালো যুক্তি যদিও মেলেনি কোথাও। কবি সাহিত্যিকরা যেমন বলেছেন, পৌনঃপুনিকতা থাকলেও গীতিকার হিসেবে বা সুরের বৈচিত্র্যে নজরুলের তুলনা নেই, কিন্তু কবিতায় ভাষার ব্যবহারে তিনি খানিকটা প্রাচীন, আধুনিকতার সঙ্গে শব্দগুলি ঠিক খাপ খায় না। তাছাড়া তাঁর কবিতায় রহস্যময়তার অভাব রয়েছে। এসব যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে কেউ কেউ বলেছেন অন্য কথা, নজরুলের মেঠো লড়াইয়ের ভাষাই তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল সাধারণের কাছে, এখনও তা ওপার বাংলায় একইরকম সমাদৃত। তবে কি বলতে হবে, ওপারের মানুষের মনে এখনও আধুনিকতা আসেনি? সাহিত্য জগতের বাইরের লোকের মত হল, নজরুলকে অন্তরালে পাঠিয়ে দেওয়ার পেছনে সুকৌশলী পরিকল্পনা আছে, কারণ অধর্মের যুগে মানুষ বাঁচার উদ্দেশ্যে ধর্মের অন্যায় ব্যবহার করে।

আসলে ক্ষ্যাপা কবি সাফ সাফ বলে দিতে পেরেছিলেন— যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না, মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত!

যে মানব প্রেম, আবেগ, স্বদেশিয়ানা, অসম্প্রদায়িকতা, যৌবনের জয়গান, প্রকৃতি, পৃথিবীর প্রতি গভীর ভালবাসা; নিরন্ন, দরিদ্র মানুষের জন্য নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন, ঈশ্বরভক্তির কথা বলেছেন নজরুল তার আবেদন বা প্রয়োজন কি সত্যিই ফুরিয়ে গিয়েছে? আমরা কি পেয়ে গিয়েছি সেই কাঙ্খিত পৃথিবী? সত্যিই কি কোথাও বিদ্রোহ, বিপ্লব, আন্দোলনের কোনও প্রয়োজনই নেই? সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জমান সে কণ্ঠস্বরকে বিস্মরণের অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল! তাঁকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই?

তনুশ্রী পাল

ছবির কৃতজ্ঞতা www.kazinazrulislam.org

কোচবিহার জেলার পত্রিকাপঞ্জীতে প্রথম তিন তারকা

রাজ আনুকুল্যে নয়, গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া ছাপোষা অক্ষরশিল্পীদের নিজস্ব ট্যাকের পয়সায় বেরত পত্রিকাগুলি। নিজস্ব জেদে অটল মহিমায় ভাস্বর। আজকের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলিতে তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে সময় যে বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলী তৈরি করতে পেরেছিল পত্রিকাগুলি, আজকের যুগে সেই পাঠকই বা কোথায়? অথচ কোনও বই বা পত্রিকার নিজস্ব গুণমানই যে পাঠক খুঁজে নেয় তা নিয়ে আজও সন্দেহ নেই।

এক। অয়ন

"মন্দ হতে যদি না আসে ভালো
রাত্রি পোহাবে না হবে না আলো।"

কবি অন্নদাশংকর রায়ের এই 'মাঙ্গলিক' কবিতাটির মাধ্যমে যে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল তা পশ্চিমবঙ্গের সদ্য হওয়া 'জেলা' কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫০ সালে। দিনহাটা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারা তিনদিক ঘেরা একটি মহকুমা। এই মফস্বল শহরে তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়। বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী শিবির, খাদ্য সংস্থানের হাহাকার। বাসস্থান ও বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হয়ে পথ খুঁজছে উদ্বাস্তু মানুষ। সেরকম সময়ে দিনহাটার কবি-সাহিত্যিক প্রবোধ চন্দ্র পাল প্রকাশ করলেন সাহিত্য পত্রিকা 'অয়ন'। প্রথম সংখ্যাতে 'অয়ন'কে দ্বিমাসিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হল, "কাগজকীর্ণ বাংলাদেশের কোণা থেকে আরো একখানা গজালো— সখ করে এর নাম দিলাম 'অয়ন'। তরাই-এর তলদেশে যে কুচবিহার এতদিন কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছিল মনে করছেন বুঝি— সামন্ত প্রথার অবাঞ্ছিত বাহুবন্ধ ছেড়ে সরাসরি আজ সে আনন্দের দরজায় দাঁড়িয়ে, তাই কাঁকন তার কিনি কিনি করে উঠেছে— ভুলেও ভাববেন না। এখানে আনন্দ নেই; পত্র-সম্পাদনা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। তবু কেন গজায়? রঙ নেই, জৌলুস নেই, তবে কেন আগাছা?"

'এই কেন গজায়' প্রশ্নটি কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন। লিটিল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন চিরকালীন। জন্মলগ্ন থেকেই তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তবু লিটিল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়, অকালে ঝরে পড়ে কালের গর্ভে। অবিরাম এক স্রোতোধারা যেন!

পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোচবিহার কিন্তু অর্বাচীন নয়। দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তার। রাজন্য শাসিত কোচবিহারে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়ে সারা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কোচবিহারের প্রথম সাময়িক পত্র 'কোচবিহার মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। রাজপরিবারের সদস্য কুমার রঙ্গিলনারায়ণের সম্পাদনায় রাজকীয় মুদ্রণালয় থেকে এর প্রকাশ ঘটে। এর সম্বন্ধে কলকাতার 'এডুকেশন গেজেট' লেখে— 'লেখা উত্তম হইতেছে। আর একটি আহ্লাদের বিষয় এই, কোচবিহারের ন্যায় স্থান হইতে এরূপ একখানি অনবদ্য পত্রিকা বাহির হইতেছে।'

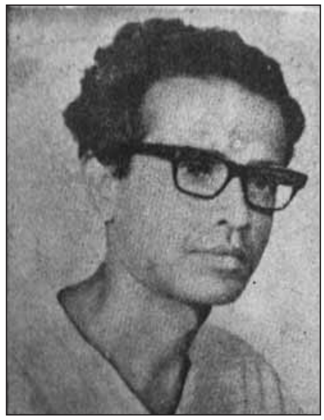

প্রবোধ চন্দ্র পাল, অয়ন পত্রিকার সম্পাদক

১৮৮৪ তে 'The Cooch Behar Gazzette', যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক 'কুলশাস্ত্রদীপিকা' (১২৯২ ব.), যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা (১৮৮৬-৮৭), 'সুকথা', ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাদাস গুপ্তের 'স্যানিটেশন' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলির পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষসুন্দর সেন 'কাঙ্গাল মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। রাজরোষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এর পিছনে নিশ্চয়ই রাজকীয় অর্থ ছিল না। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী 'কোচবিহার সাহিত্য সভা' থেকে 'পরিচাকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি গৌরবান্বিত হয়েছে। এতেও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

এপ্রিল জানকীবল্লভ বিশ্বাস ও শরৎচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা 'কোচবিহার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পরে মাসিকে পরিণত হয়। এর শেষ সম্পাদক ছিলেন অমূল্য রতন গুপ্ত। অমূল্য রতনবাবু লিখেছেন, 'কোচবিহারের ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলা কি না সেই সম্বন্ধে তৎকালীন রাজপুরুষগণের মনে সন্দেহ জাগে এবং তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, কুচবিহার হইতে একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা নিতান্তই অযৌক্তিক। সুতরাং রাজসরকারের আদেশে পত্রিকাখানির প্রকাশ বৎসরের মধ্যভাগেই বন্ধ হইয়া যায়। ১০ বছর পত্রিকাটি চলেছিল। এত সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভার রচিত ও অনুদিত হওয়ার পর কেন ভাষা নিয়ে হঠাৎ এই রাজদরবারে সন্দেহ জাগল তা ঠিক বোধগম্য হয় না। তবে এর পিছনে অন্য কিছু আছে। এরপর ব্যক্তি উদ্যোগে কোচবিহার ও মাথাভাঙ্গা থেকে পত্রিকা প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পর 'অয়ন' প্রথম লিটিল ম্যাগাজিন। পত্রিকাটি প্রকৃতই লিটিল ম্যাগাজিন বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এর প্রধান কারণ, এতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। রাজ আমলে 'কাঙাল' ও মাথাভাঙ্গা ও কোচবিহারের দু একটি পত্রিকায় শুধু রাজকীয় অর্থের পরিবর্তে স্বল্প পুঁজি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমার নিজস্ব সংগ্রহকেন্দ্র 'প্রথম সংখ্যা সংগ্রহাগারে' 'অয়ন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আরও তিনটি সংখ্যা সংরক্ষিত আছে। প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র থেকে লেখক তালিকা তুলে দিচ্ছি। তালিকায় অন্নদাশংকর রায়, মণীন্দ্র রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, আবু তাহের প্রমুখের সঙ্গে আছেন প্রবোধ চন্দ্র পাল, ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল, অশনিভূষণ মজুমদার, মানবকুমার রায়, মমতাজ খাতুন, স্মৃতিময় দে ও ম্যাক্সিম গোর্কির রচনার অনুবাদে 'জাতক' ছদ্মনামের কোনো লেখক। অনেকেই পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এর প্রকাশক ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল। প্রথম সংখ্যা লিটিল ম্যাগাজিনের ধর্ম মেনে 'নতুন লেখকদের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়' কথাটি মুদ্রিত হয়েছে। 'অয়ন' সম্পাদক নিজে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পত্রিকাটি ছিল তার বাইরে। 'সম্পাদকীয়'তে পাই, "অতএব 'অয়ন'— সখ করে বলি তাকে জার্নাল। মুশকিল কি জানেন? জার্নাল মাত্রই কোনো একটা পক্ষ না নিলে হালে আর পানি পায় না। এতএব নিলাম পক্ষ সাহিত্যের।" প্রথম সংখ্যায় কবি মণীন্দ্র রায়ের 'স্বাধীনতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত

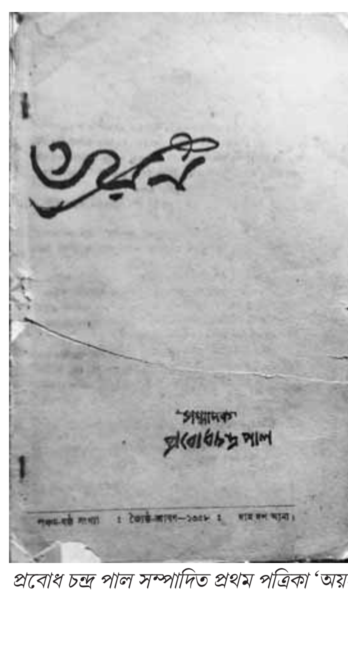

প্রবোধ চন্দ্র পাল সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'অয়ন'

করছি— "তোমাকেই ডাকে,/ তোমারই আশায় তারা চেয়ে থাকে;/ তাদের চোখের ভাষায়,/ মনের আশায়, / রাতের আকাশে বারে বারে যেন আসে প্রভাত—/ বন্ধ দুয়ারে করে করাঘাত, / কাক জোৎস্নার পাখী / হঠাৎ ডাকার আনন্দে ডাকে থেমে যায় বুঝে ফাঁকি।" কী বলিষ্ঠ উচ্চারণ। 'স্বাধীনতার ফাঁকি' কতটা বাস্তব তা মানুষ যুগে যুগে অনুধাবন করছে পৃথিবী জুড়ে। প্রথম সংখ্যাতেই মাটির কাছাকাছি বাস করা মানুষদের লোকসংস্কৃতি 'বিষহরি' আলোচনায় উঠে এসেছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় কোচবিহারের সাময়িক পত্র বিষয়ে অমূল্য রতন গুপ্ত মূল্যবান রচনা লিখেছেন। গল্প লিখেছেন প্রসেনজিৎ বর্মণ, যিনি পরবর্তীতে বিধায়ক ও সাংসদ হয়েছেন। এ সংখ্যায় কয়েকটি অণু গল্পের মতো লেখা আছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেশের সংকট, সম্পাদকের সংকট, পত্রিকার সংকট একাকার হয়ে গেছে সম্পাদকীয়তে। এতে তিনি লিখেছেন, "কিছুদিন যাবত কুচবিহার অশান্তি পীড়িত। এই অশান্তি ও আলোড়নের ফলে আমাদের এ কাজ ব্যহত হয়েছে। অসম্ভব শোনালেও একথা সত্য যে খাদ্য সংকট সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিপণ করে। ইতিমধ্যে 'অয়ন'এর সম্পাদককে দুবার জেলে যেতে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চার্জে তিনটি মামলা চলছে। অয়নের অন্যান্য কর্মীরাও নানাভাবে দুর্ভোগ ভুগেছেন। কাগজের, প্রেসের ও অর্থের সংকটের উপর রাজরোষের ফলে অয়ন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবু 'অয়ন' বন্ধ হয়নি।

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লেখক তালিকায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম রয়েছে। বঙ্কিম ও সাহিত্য অ্যাকাডেমি (১৯৮৬) প্রাপ্ত এই লেখকের রচনাবলি প্রকাশের সময় এই মূল্যবান গল্পটির হদিশ মেলেনি।

'অয়ন' সে সময় কোচবিহারে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছে। তাদের মধ্যমণি হয়ে ছিলেন প্রবোধ চন্দ্র পাল। পত্রিকাটি প্রথমে 'দ্বিমাসিক' হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে মাসিকে পরিণত হয়। প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নবীন এক জেলার সন্তান যে প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করতে পেরেছিলেন পত্রিকাটির মাধ্যমে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুর্দম সাহস থাকলেই এরকম করা যায় বলে আমার বিশ্বাস।

প্রবোধ চন্দ্র পাল দিনহাটা মহকুমার আবুতারায় জন্মেছিলেন। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। কিন্তু নেশা রাজনীতি ও সাহিত্য। বারে বারে তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কলম থামেনি। তার একটি কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালা' ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে 'শঙ্খহৃদয়' উপন্যাস ও 'শেষ নাচ' নামে একটি গল্প সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি কাব্য ও উপন্যাস প্রস্তুত থাকলেও প্রকাশের মুখ দেখতে পায়নি। তার গ্রন্থগুলি কিন্তু সমকালীন সময়ের ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে এমন উপাদানে ঠাসা। অকালে প্রাণ বিসর্জন দিলেও কোচবিহারের সাহিত্যের ইতিহাস তাঁকে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না।

দুই। ত্রিবৃত্ত

উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে 'ত্রিবৃত্ত' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মাত্র গুটিকয় পত্রিকা যখন সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রকাশিত হত তখন 'ত্রিবৃত্তের' আবির্ভাব। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে। সম্পাদক ছিলেন রণজিৎ দেব। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি বাংলার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে কে লেখেননি এই পত্রিকায়। শক্তি, সুনীল তো আছেনই, খ্যাতনামা বঙ্গ সাহিত্যিকদের সঙ্গে বহু নবীন কবি ও সাহিত্যিকরাও এতে লিখে চলেছেন সমানতালে।

'ত্রিবৃত্ত' ১৯৬৯ সালে সরকারি নথিভূক্ত হয়। তাই এই সময় থেকেই প্রকাশ কাল ধরা হয়। সেই হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে পত্রিকাটি। একই সময়ে বা পরে প্রকাশিত বহু পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এর জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রণজিৎ দেবের স্ত্রী শ্বাশতী দেব। তিনিও নিজে কবি।

এই সুদীর্ঘ সময়কালে ত্রিবৃত্তের অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'উত্তরবঙ্গ সংখ্যা' প্রথম ত্রিবৃত্তই প্রকাশ করে। আর এক বিখ্যাত পত্রিকা 'মধুপর্ণী'র

প্রবোধ চন্দ্র পাল দিনহাটা মহকুমার আবুতারায় জন্মেছিলেন। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। কিন্তু নেশা রাজনীতি ও সাহিত্য। বারে বারে তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। কিন্তু তার কলম থামেনি। তার গ্রন্থগুলি কিন্তু সমকালীন সময়ের ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে এমন উপাদানে ঠাসা। অকালে প্রাণ বিসর্জন দিলেও কোচবিহারের সাহিত্যের ইতিহাস তাকে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না।

উত্তরবঙ্গ সংখ্যা এর অনেক পরে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। এমননকি কলকাতার লেখকরাও এরকম বিষয়ে কলম ধরেছেন। সেই দিক থেকে উত্তরবঙ্গ সংখ্যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৭৩, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দুটি উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সংখ্যা। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা বাংলা ও বাংলাদেশ সংখ্যা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে সাহিত্যিক নীরজ বিশ্বাস ও অতীন্দ্র পাঠক সংখ্যা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যটন সংখ্যা, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার উৎসব সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি সংখ্যা ইত্যাদির প্রকাশ ত্রিবৃত্তের অনন্য অবদান। এছাড়া নিয়মিত সংখ্যা ও শারদ সংখ্যাগুলি তো আছেই।

বিশেষ সংখ্যাগুলি ছাড়া অন্যান্য সংখ্যা সুনির্বাচিত কবিতা, প্রবন্ধ, লোকসংস্কৃতি, গল্প, আত্মকথন ইত্যাদিতে ঠাসা থাকে। তবে কবিতার সংখ্যাই বেশি থাকে। রণজিৎ দেব ও শ্বাশতী দেবের কবিসত্ত্বাই বোধহয় কবিতা প্রাধান্যের অন্যতম কারণ। আসলে ত্রিবৃত্ত ভাল কবিতাকে জায়গা করে দিতে সবসময়ই তৎপর। আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির প্রথম দিকের লেখাগুলি প্রকাশ করার সাহস কিন্তু ত্রিবৃত্তই দেখিয়েছে।

'ত্রিবৃত্ত'-কে পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সব সময়ই করেছেন বলে জানালেন। শ্বাশতী দেব ও রণজিৎ দেব— এই কবি দম্পতির চেষ্টা কিন্তু সব সময় অব্যাহত আছে পত্রিকাটি সচল রাখার ক্ষেত্রে। তাই এই পত্রিকার প্রকাশ নথিভূক্তিকরণের অর্ধশত বর্ষে আজও অমলিন।

তিন। অন্যস্বর

কোচবিহার থেকে প্রকাশিত আরেকটি একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা 'অন্যস্বর'। অন্যস্বর একটি সার্থকনামা পত্রিকা। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের রথযাত্রায় এর যাত্রা শুরু। পত্রিকার উপরে ছাপা থাকত একটি ক্যাপশন— 'অন্যস্বর সাহিত্যের ছোটো কাগজ'। এই পত্রিকাটির নামকরণের ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। সে সময় কোচবিহারে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়। সেই লেখকগোষ্ঠী স্থির করে তারা যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করবেন সেগুলির নাম হবে চারটি অক্ষর বিশিষ্ট। এই ভাবনার ফসল 'অন্যস্বর', 'চিত্রকল্প' (সম্পাদক অমর চক্রবর্তী), 'তমসুক' (সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি পত্রিকা।

'অন্যস্বর' সম্পাদনা করেন স্বপন কুমার রায়। কোচবিহার শহরের পাটাকুড়া এলাকার সাহিত্যসভা বাইলেন থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন হয়ে ওঠার উপাদানে ঠাসা সাহিত্যের এই কাগজটি। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে তাই লেখা হয়েছে 'অগ্রজ কবিদের পাশাপাশি তরুণতম কবিদের কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন যে কোনও সম্পাদকের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।
সংগীত-নাটক-চিত্রকলা একাকার করা সংস্কৃতি পরিক্রমা হয়ত ভাল লাগবে'। এরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ সম্পাদনার গুণে প্রতিটি সংখ্যায় ছাপ রেখে গেছে। প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকায় কবি হিসেবে আছেন বিশ্বনাথ দাস, সমীর চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রুদ্র, অর্ণব সেন, বিপ্লব রক্ষিত , স্বপন কুমার রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যারা নিজেদের লেখনীর গুণে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠেছেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। অমর চক্রবর্তী মূলত কবি। তবে তিনি এই সংখ্যায় প্রতিবেদন লিখেছেন।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টি 'সাহিত্য বনাম সাহিত্যিক' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এতেও বলিষ্ঠ কথার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। সম্পাদক লিখেছেন তা থেকে উদ্ধৃত না করলে এই পত্রিকা সম্বন্ধে লেখাটি অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি লিখেছেন, "কিছু কিছু লেখক যাদের সত্যি অর্থে লেখক হিসেবে গণ্য করা যায় কি না সন্দেহ, আপন দুর্গ গড়তে সচেষ্ট। একদিকে এই সমস্ত দুর্গ-সচেতন লেখকগোষ্ঠী যেমন নিজেরাই নিজেদের ভাবমূর্তি গড়তে সচেষ্টে, অন্যদিকে একই সঙ্গে নামীদামী লেখকেরা পাল্লা দিয়ে স্বনাম কীর্তন গেয়ে চলেছেন।... আসল ব্যাপার হল লেখাটাকে লেখার নিরিখে দেখা

হয় না। আর সেই জন্যই তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকের হাটে আসল লিখিয়েরা হারিয়ে যান... সাহিত্যিকের স্বার্থে তাই দুর্গ নস্যাৎ করা দরকার। 'অন্যস্বর' দুর্গ গড়তে চায় না। অন্যরকম স্বরকে সুরে বাঁধতে চায়।" এ প্রচেষ্টার ফলে আমরা একের পর এক ভাল ভাল সংখ্যা পেয়েছি।

যেমন 'অন্যস্বর ২০' সংখ্যাটি। এর বিষয় 'প্রাচীন কবিতা বিশেষ সংখ্যা'। এখানে প্রাচীন কবিতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে অবহেলিত কিন্তু সমাদৃত হওয়ার যোগ্য ও সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভারে পূর্ণ কোচবিহারের রাজদরবার ও রাজদরবারের বাইরে রচিত কাব্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংখ্যাটি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যা। এর কবি তালিকা প্রয়োজনীয় বলে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি— দুর্গাবর দাস, পীতাম্বর, শংকরদেব, অনন্তকন্দলী, গোবিন্দ

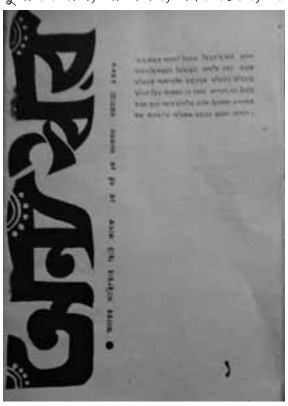

মিশ্র, মহারাজা প্রাণনারায়ণ, কবিশেখর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, দ্বিজ কবিরাজ, দ্বিজ রাম, দ্বিজনারায়ণ, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, দ্বিজপরমানন্দ, দ্বিজ বৈদ্যনাথ, রামনন্দন, দ্বিজ রঘুরাম, দ্বিজ মহিনাথ, লক্ষ্মীরাম, শ্রী ব্রজসুন্দর, দ্বিজ কীর্তিচন্দ্র, দ্বিজ রুদ্রদেব, দ্বিজ ভূতনাথ, শতানন্দ, দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ, সারদানন্দ, মাধবচন্দ্র শর্মা, মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ, মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবী, রিপুঞ্জয়, জয়দেব, দ্বিজ জগন্নাথ, ব্রজসুন্দর শর্মা, রাম-নারায়ণ, দেবনাথ দ্বিজ, দ্বিজ পশুপতি, অর্জুন দ্বিজ, দ্বিজ ভগীরথ, শ্রী মামুন্দ কালা, রাধাকৃষ্ণ দাস, মহারানি সুনীতি দেবী ও নিরুপমা দেবী। কোচবিহারের সাহিত্যের মণিমনিক্যগুলি দু' মলাটের মধ্যে এর আগে পাওয়া যায়নি। কাব্যাংশ হলেও প্রত্যেকের লেখনীর স্বাদ ও প্রতিভার পরিচয় এতে মেলে।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক। তাঁকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা প্রকাশ করেছে 'অন্যস্বর' (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৮৫)। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস, ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা যেমন এতে আছে তেমনই আছে পত্র-পত্রিকায় সতীনাথ বিষয়ক আলোচনাপঞ্জি। গবেষকদের কাছে অবশ্যই সমাদর পাওয়ার যোগ্য সংখ্যাটি। এছাড়া কোচবিহারের প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, ভূমিকম্প সংখ্যা, হাংরি জেনারেশন সংখ্যা, উত্তরের সাম্প্রতিক সংখ্যা, শ্রুতি আন্দোলন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। উত্তরের সাম্প্রতিক সংখ্যায় সমকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের দুই-তিনজন করে সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার। আলোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি সংখ্যা জুড়ে।

স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সে সময়ে জনে জনে চিঠি লিখে লেখা সংগ্রহ করার কঠিন কাজটি করেছেন পত্রিকা সম্পাদক স্বপন কুমার রায়। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি বড় খুঁতখুঁতে। আর এটাই তার সম্পাদনার সম্পদ। এ জন্যই আমরা নিখুঁত সংখ্যাগুলি পেয়েছি।

জলপাইগুড়ির ইতিহাস

বইপত্র সাহিত্য

জলপাইগুড়ি জেলার ১৫০ বর্ষ পূর্তিতে শ্রী উমেশ শর্মা বিরচিত 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ। জলপাইগুড়ি জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বান ছিল— 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই,... কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।' 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এ কথা স্মরণ করে উমেশবাবু লিখেছেন— 'এ জনপদের ইতিহাসের ভূগোল, ভূগোলের ইতিহাস' খোঁজার একটা প্রচেষ্টা। এরূপ চিন্তনের ফসল 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস' (১ম খণ্ড) রূপে বইটির আত্মপ্রকাশ। 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস রচনার মতো পরিশ্রম সাধ্য বিষয়ে আত্মনিয়োগের জন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবার্দাহ। জলপাইগুড়ির এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মোট দশটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থও পত্রপত্রিকার কথা। সেই সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস, জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস রচনার অন্তরায় ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে জলপাইগুড়ির জনপদ ও তারবসবাসকারীদের কথা। সঙ্গে রয়েছে বরেন্দ্র ভূমি, পুন্ড্রবর্ধন, প্রাগ জ্যোতিষপুর, কামরূপ, গৌড়ের পাল রাজত্বের উত্তরবঙ্গের ইতিহাস। তৃতীয় অধ্যায় কামতাবিহার ও জলপাইগুড়ি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়। চতুর্থ অধ্যায় বৈকুণ্ঠপুর জলপাইগুড়ি ও রায়কত রাজবংশ ও তৎকালীন সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়, যা পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থিত হয়েছে দেশি-বিদেশি শাসনপর্বের কিছু নথি, দলিল দস্তাবেজ। অষ্টম অধ্যায়ে স্বাধীনতা পূর্ব জলপাইগুড়ি (১৮৬৯-১৯৪৭)। নবম অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু পর্যটন ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিবরণ ও আলোকচিত্র। দশম অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু নথি ও মানচিত্র। উমেশবাবু জলপাইগুড়ির ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন পুরাণ, সাহিত্য, কিংবদন্তী, দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং পূর্বগামীদের বিবরণে। মুখ্যত তিনি দীর্ঘ কাল ধরে বহু গবেষকের, পণ্ডিতবর্গের যত্নে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করেই জলপাইগুড়ির ইতিহাস রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে তথ্যসূত্র আছে। তবে তথ্যসূত্রে যে সব প্রবন্ধ রচয়িতার নাম আছে, উমেশবাবু তার রচিত অংশে অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের নাম উল্লেখ করেননি। এতে বেশি উদ্ধৃতি সম্বলিত হওয়ায়, তার নিজস্ব বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়নি। তবে নিজস্ব অনুসন্ধান, অভিমতও আছে, যে সব নিয়ে তর্ক-বিতর্কও উঠতে পারে। দু'-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জলপাইগুড়ি জেলার নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি 'জলপালিয়া গোষ্ঠী'র কথা বলেছেন। এরা বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে জল সরবরাহ করতেন। জলদাপাড়া, জলদিয়াপাড়া, জলপাইগুড়িতে এদের প্রচুর ভূখণ্ড ছিল। স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত রাজা 'জল্প' এই জলপায়ী গোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষ। শিবের মাথায় এরাই সর্বাগ্রে জলদান করতেন। এই জলপায়ী জনগোষ্ঠীর বাসস্থান হিসেবে 'জলপাইগুড়ি' নামের উৎপত্তিকেই তিনি 'ইতিহাস সম্মত' বলে মনে করেছেন।
বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বরের মধ্যে তিনি রায়কত বংশের রাজা দর্পদেবের ছায়া দেখেছেন। 'তিস্তার শরীর করতোয়া নদীর উৎপত্তি। শিবের কর ধোওয়া জল থেকে করতোয়ার সৃষ্টি (পৃঃ ৬৫)। বহু 'মিথ' রয়েছে তার বইতে। সঠিক ইতিহাস চেতনার আলোকে এই মিথগুলিকে ভেঙে ইতিহাসের সত্য, ভৌগোলিক সত্যের সন্ধান দিতে পারতেন। জলপাইগুড়ির ইতিহাস রচনায় পূর্বগামীরা, রেবতী মোহন লাহিড়ি, অরুণ ভূষণ মজুমদার, উপেন্দ্র নাথ বর্মণ, চারুচন্দ্র সান্যাল, নির্মল চৌধুরীরা যে পথরেখা নির্মাণ করেছিলেন, তা আরও বিস্তৃত হতে পারত। অরুণ ভূষণ মজুমদার 'জলপাইগুড়ি শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থের' উনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর প্রবন্ধে লিখেছেন 'আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাসগত নাম বৈকুণ্ঠপুর'। রেবতীমোহন লাহিড়ী লিখেছেন— 'জলপাইগুড়ির কোন পৃথক রাজনৈতিক সত্ত্বা ছিল না— ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল... বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার (পাকিস্তান কবলিত অংশ সহিত) আরম্ভ ১৮৬৯ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে। ভগদত্তের সময় প্রাক-জ্যোতিষ একটি বিরাট রাজ্য ছিল— বর্তমান আসাম, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, শ্রী হট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষ লইয়া একটি বিরাট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।' উমেশবাবু এই প্রাচীন জলপাইগুড়ি থেকে আধুনিক জলপাইগুড়ির ১৯৪৭ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা করেছেন। তবে নামে জলপাইগুড়ির ইতিহাস হলেও কামরূপ, কুচবিহার, বিজনীর ইতিহাসের বিবরণও এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এ গ্রন্থের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে (চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অধ্যায়) বৈকুণ্ঠপুর তথা রায়কত রাজবংশের ইতিহাস। যা উমেশবাবুর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ 'জলপাইগুড়ি রায়কত বংশের রাজর্ষি' থেকে সংকলিত। শুধু 'রাজবৃত্ত' নয় 'লোকবৃত্তের' পরিচয়েই ইতিহাসের সম্পূর্ণতা, 'জলপাইগুড়ির ইতিহাসে'। এই রাজবৃত্তের গুরুত্বই একটু বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয়েছে। এ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু পর্যটন ক্ষেত্রর বিবরণ রয়েছে। চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা জুড়ে এইসব পর্যটন ক্ষেত্রর বর্ণনা সত্যিই কি এই ইতিহাস গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য ছিল? এই পর্যটন ক্ষেত্রসহ বহু বিবরণ ও তথ্য সমাহার ইতিহাস গ্রন্থটিকে প্রায় গেজেটিয়ার ধর্মী করে তুলেছে। গেজেটিয়ার ইতিহাস রচনার আকর গ্রন্থ কিন্তু তা ইতিহাস হতে পারে না।

এই গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি উমেশবাবুর লিখিত বইগুলির অনুরাগী পাঠক মাত্র। প্রবোধচন্দ্র সেন— 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' গ্রন্থে আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন 'ইতিহাস-সাহিত্য'র কথা যা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে একটা বড় আকার ধারণ করেছে। আমি ইতিহাসবিদ নই, উমেশবাবু প্রণীত 'জলপাইগুড়ির ইতিহাস' গ্রন্থটিকে 'ইতিহাস' না 'ইতিহাস-সাহিত্য' বলা হবে? এ প্রশ্ন কৃতবিদ্য ইতিহাসবিদদের কাছে রেখেই এ আলোচনা শেষ করছি।

জলপাইগুড়ির ইতিহাস। উমেশ শর্মা।
কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৮।
মূল্য ৫০০ টাকা মাত্র।

দিনাজপুরের দিনকাল

ধানসিঁড়ির সংগ্রহশালা উত্তরের অহংকার

ছোটবেলা থেকেই নেশা ছিল গান-বাজনার। আকর্ষণ করত তালবাদ্য, ঢোল, খোল, পার্কাশন এবং ছন্দ। উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা সদর রায়গঞ্জের বাসিন্দা মলয় দে সরকার। পড়াশোনার তাগিদেই বাবার অনুপ্রেরণায় কলকাতায় যাওয়া। আসা-যাওয়ার পথে ম্যাক্সমুলার ভবন, বিটোফোনের সুরমূর্ছনা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিভিন্ন ধরনের মিউজিক কনফারেন্সের পোস্টার ভীষণভাবেই টানত মলয়কে। আর এইভাবেই গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। অবশেষে সময়কাল পরিবর্তিত হয়। সঙ্গীত এবং ব্যবসা সম্বল করে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ে মলয়। ছোট্ট শহর রায়গঞ্জে গড়ে তোলে ছোট্ট এক বিপণি। একটু অন্যরকমের ব্যবসা। বেহালায় পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং ল্যাটিন পারকাশন বা তালবাদ্য শিক্ষার সঙ্গে নিয়মিত বাজান দোতারা, একতারা, গুবগুবি, এবং বাংলা ঢোল। পাশাপাশি সংস্কৃতিমনস্ক এবং সাহিত্যানুরাগী মলয়ের উদ্যোগে পুরনো এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এক অভিনব বই বাজার গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটি এলাকার নিশীথ সরণিতে। পুরনো এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এই অভিনব বিক্রয় কেন্দ্রের নাম 'ধানসিঁড়ি'। প্রত্যন্ত শহর উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে এই বই বাজারে কেবলমাত্র দুষ্প্রাপ্য, পুরনো এবং নতুন পাঠ্য বইয়ের বিক্রি নয়, নামমাত্র দক্ষিণায় স্কুল-কলেজ পড়ুয়া এবং গবেষকদের ভাড়াও দেওয়া বইপত্র। নান্দনিক ভাবনার অভিনব এই বিক্রয় কেন্দ্রে বাংলা গ্রিটিংস কার্ড, ডোকরা, টেরাকোটার জিনিসপত্র, কালীঘাটের পটচিত্র, প্রাচীন বইপত্র সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

ধানসিঁড়ির সংগ্রহশালায় রয়েছে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রকাশিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 'চক্র দত্ত'। রয়েছে গোপাল ভট্ট বিরচিত 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ' এবং মহামতি শ্রীমদ বাগ ভট্টাচার্য রচিত 'রসরত্ন সমুচ্চয়' আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। 'চক্রদত্ত' ৭১০ পৃষ্ঠার বই। প্রকাশস্থল ২৯ নম্বর কলুটোলা স্ট্রিট, কলকাতা। দাম ২০ টাকা হলেও এখন বইটি বিক্রির দাম ১৪০০ টাকা। 'রসরত্ন সমুচ্চয়'-এর দাম ২ টাকা মুদ্রিত থাকলেও এখন তার দাম ৭৫০ টাকা। আবার 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ'-এর দাম এক টাকা লেখা থাকলেও বইটির বিক্রয় মূল্য ৮০০ টাকা। শনিবারের চিঠির ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আশ্বিনের সংখ্যাগুলিও আছে মলয়ের দোকানে। ১৩৪৭ এর ১২ তম বর্ষ বৈশাখ সংখ্যায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। এছাড়াও রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাহিত্যসভায় বার্ষিক শরৎ স্মৃতি অধিবেশনে পঠিত 'শরৎ পরিচয়'। জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় বনফুলের 'মৃগয়া' নাটক, আষাঢ় সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদারের প্রবন্ধ 'সাহিত্য বিচার' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'পুনশ্চ'। শ্রাবণ সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা 'মধু উদ্বোধন' এবং ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ছোটগল্প 'ভেলকি মার্গ', মোহিতলাল মজুমদারের 'গৌরব স্বল্প বচন'। আশ্বিন সংখ্যায় বনফুলের গল্প 'ভৌতিক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিল্লিকা লাড্ডু' এবং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুধার প্রেম'-এর সংগ্রহ দেখার মতো। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত বাঁধানো সংখ্যাটির চলতি বিক্রির দাম ২২৫ টাকা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের 'পরিচয়' পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকায়। রয়েছে মণীশ ঘটকের 'যুদ্ধ-যুদ্ধ হোক' আর বিষ্ণু দে-র 'নিজেই অবাক হয়' কবিতা। রয়েছে 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষের' বেশ কিছু সংখ্যাও। প্রবাসীর ১৩৩২ বঙ্গাব্দের প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় রয়েছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বেনোজল', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রবাসীর আত্মকথা'। ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'পূব হাওয়াতে দেয় দোল'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' সচিত্র মাসিক পত্রের ১৩৪৯-এর পৌষ থেকে জৈষ্ঠ্য ১৩৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি রয়েছে ধানসিঁড়িতে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'দুঃখীর প্রার্থনা' কবিতাটি স্থান পেয়েছে ত্রিংশ বর্ষ পৌষ সংখ্যায়। প্রবাসী ও ভারতবর্ষের সংখ্যাগুলি বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকায়। এসব ছাড়াও এখানে রয়েছে শিল্পকলা, চিত্রকলা, সার্কাস এবং লোকশিল্পীদের ওপর মূল্যবান প্রাচীন এবং আধুনিক বইয়ের বিচিত্র সম্ভার। যেমন 'দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেটেস্ট ফোক আর্ট'। পাবলো পিকাসো, ভ্যান গগ, পলগঁগা, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারি ফ্রম মুর্শিদাবাদ', ময়নমনসিংহের রামগোপালপুরের জমিদার নরেন্দ্র চৌধুরীর 'দ্য মিউজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থ। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ৩ টাকা দামের এই বইটি ১২৫ টাকায় কিনে নিয়ে গেলেন একজন সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত অক্সফোর্ড পাবলিকেশনের 'কালচারাল অ্যানথ্রপলজি' বইটির দাম ৮টাকা ২৫ পয়সা হলেও বইটি বিকোলো নগদ ৫০০ টাকায়। 'সার্কাসেস অফ বাংলাদেশ' বইটির দাম বারোশো টাকা। মলয় এর মধ্যে বইটির অর্ডার পেয়ে গেছে। অর্ডার রয়েছে রাজশেখর বসুর 'একাল সেকাল' এবং পেইন্টিংয়ের উপরে বেশ কয়েকটা বই। একথা জানালো খোদ মলয়। সৌখিন ভাললাগা থেকে একদিন ব্যতিক্রমী ডোকরা, টেরাকোটার জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রাচীন বইপত্র রাখা শুরু করলেও মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের তিন জেলা থেকেও খদ্দের পান তিনি। অধিকাংশই হয় শিক্ষক, নয় অধ্যাপক অথবা গবেষক। রোজগার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু উৎসাহে ঘাটতি নেই এতটুকুও। পরিবারে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারার জন্য তিরস্কার আছে, কিন্তু আত্মগ্লানি নেই মলয়ের।

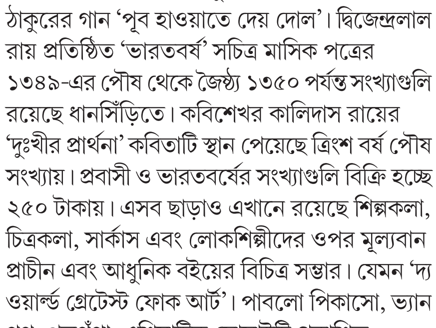
নিজের দোকানে মলয় দে সরকার

বাঙালির জীবন থেকে বই এখনও একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি তার প্রমাণ এই বই বাজার। রায়গঞ্জের মোহনবাটি এলাকার ধানসিঁড়ি বইপত্রের দোকানটি খ্যাত অখ্যাত লিটিল ম্যাগাজিন বিক্রির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জেলা, রাজ্য, এমনকি বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা সব মিলিয়ে প্রায় ১৬০ থেকে ১৭০টি পত্রিকা পাওয়া যায় ধানসিঁড়ি থেকে। কেবলমাত্র সদ্য প্রকাশিত নয়, পুরনো দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা, বই, বাছাই গানের সিডি, হস্তশিল্পের নমুনা সবই মেলে ধানসিঁড়িতে। কর্ণধার মলয় দে সরকার জানালেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পাঠকের জন্য 'মন পছন্দ' জিনিস সংগ্রহ করে আনেন। মলয়ের দোকান এবং সংগ্রহ দেখেই ভালবেসে টেরাকোটার নামফলকটি করে দিয়েছেন বিশিষ্ট ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী রামকুমার মান্না। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের 'ধানসিঁড়ি' নামে লিটল ম্যাগাজিনের এই বিপণিতে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার ১২৬টি লিটল ম্যাগাজিন কেনার জন্য পাওয়া যায়। ধানসিঁড়ি সংস্থার আমন্ত্রণে সাহিত্য আড্ডার আসরে যোগ দিয়ে গেছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, নদী গবেষক, প্রাবন্ধিক প্রমুখ। এসেছেন পরিবেশ ও সংস্কৃতি ভাবনার ত্রৈমাসিক 'ভূমধ্যসাগর' পত্রিকার সম্পাদিকা জয়া মিত্র। এছাড়াও লোকসংস্কৃতির গবেষক সাংবাদিক সুনীল চন্দ, নাট্যকার অরূপ মিত্র, কবি গৌতম মুখার্জি, সনাতন মজুমদার, রাখি মজুমদার, সুমিত চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজন 'ধানসিঁড়ি' আয়োজিত সাহিত্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। মলয়ের মতে, লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন এবং পত্র-পত্রিকা এগিয়ে চলার স্বার্থেই সাহিত্য আড্ডার প্রয়োজন। নতুন পুরনো বই এবং লিটল ম্যাগ তথা সমকালীন শিল্পশোভিত হস্তশিল্প বিক্রির অন্যতম বিপণি হিসেবে ধানসিঁড়ি ধীরে হলেও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করতে পেরেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৩ বছর ধরে ধানসিঁড়ি খুব সামান্য উদ্যোগ নিয়ে ক্রেতাদের কাছে নতুন এবং পুরনো বই, লিটিল ম্যাগাজিন বা হস্তশিল্প অথবা সমকালীন পিকচার সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে। নতুন ও পুরনো বই এবং লিটিল ম্যাগাজিনের যে সম্ভার ধানসিঁড়ি দোকানে মজুদ আছে তাতে পরিশ্রম করে সুদূর কলকাতা বা উত্তরবঙ্গের অন্য কোনও স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। সম্পূর্ণ ঠিকানা মলয় দে সরকার, নিশীথ সরণি, মোহনবাটি, পোঃ রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর ৭৩৩১৩৪। দূরভাস ৯৫৬৩৬৪৬৪৭২।

গৌতম চক্রবর্তী

শ্যুটিংয়ের স্বর্গ হলেও হালে পানি পায় না

ডুয়ার্সের চলচ্চিত্র

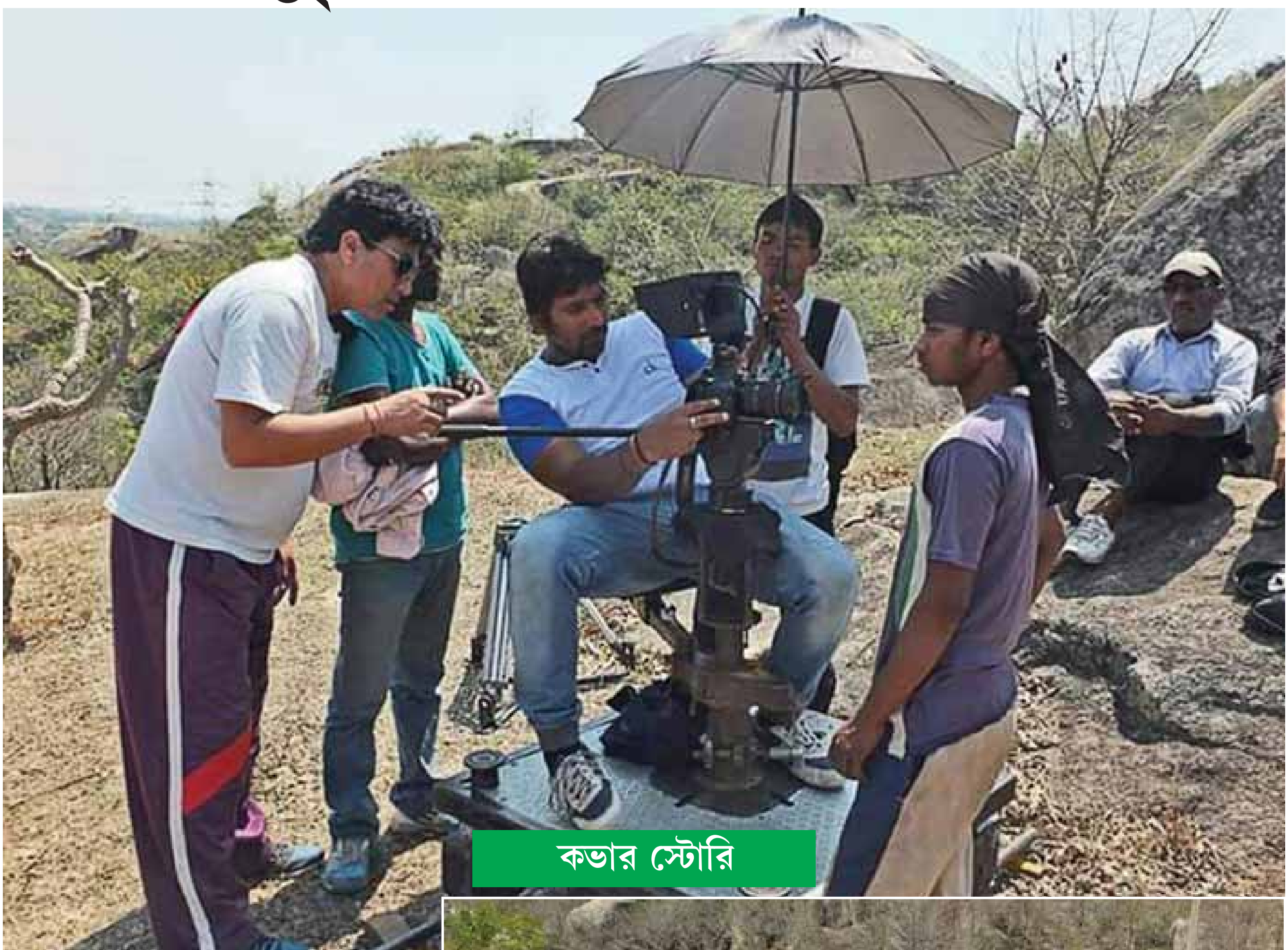

কভার স্টোরি

শ্যুটিংয়ের মুক্তাঞ্চল ডুয়ার্স

উত্তরবঙ্গে বিশেষত ডুয়ার্সে সারা বছর নানান সিনেমার শ্যুটিং চলে। মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির বাংলা সিনেমার শ্যুটিংয়ের পক্ষে আদর্শ স্থান হিসাবে পরিচিত ডুয়ার্সের জঙ্গল, নদী ও পাহাড়। আজকাল বাংলা সিরিয়ালের বিশেষ পর্বগুলির শ্যুটিংও আকছার হচ্ছে ডুয়ার্সে। অন্য ভাষার ছবির শ্যুটিং লোকেশন হিসেবেও ডুয়ার্সকে বাছা হচ্ছে। এই সময়ের প্রায় বেশ কয়েকটি বাংলা আর্ট ও বাণিজ্যিক ছবির দৃশ্যায়ণ হয়েছে ডুয়ার্সের নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে। খরচ কম, সহজেই প্রশাসনিক অনুমতি মেলে — সিনেমা শ্যুটিংয়ের এক আদর্শ মুক্তাঞ্চল হিসেবে জনপ্রিয় হওয়ার দুটিই প্রধান কারণ তো বটেই। যদিও শ্যুটিংয়ের উপযুক্ত যন্ত্রাংশ পাওয়া মোটেই সহজ নয় এই অঞ্চলে। সামান্য প্রয়োজনেই ছুটতে হয় শিলিগুড়ি বা কলকাতা। তাই একটু বড় বাজেটের ছবি হলে পুরো ইউনিটসহ ক্যামেরা,

'তোর বিনা' সিনেমার পোস্টার,

তৃতীয় নর্থ বেঙ্গল সিনে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার নিচ্ছেন দিপেন টোপ্পো

লাইট, জিমি, ট্রলি ইত্যাদি কলকাতা থেকে ভাড়া করে আনাই দস্তুর।

উত্তরের আঞ্চলিক সিনেমা

উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষাতেও সিনেমা হয়। হয়ে আসছে গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। এখানকার শিক্ষিত, শহুরে দর্শক সে খবর খুব একটা রাখেন না। কলকাতার চলচ্চিত্র সমাজ এমন নগণ্য খবর যে রাখবেন তেমন দুরাশা মোটেই কাঙ্খিত নয়। তবু উত্তরবঙ্গ জুড়ে সাদ্রী, সুর্জাপুরি, রাজবংশী, নেপালি বা বাংলা ভাষায় স্থানীয় কলাকুশলীদের নিয়ে সিনেমা তৈরি হয় এবং সেগুলো এখানকার হলগুলিতেই মুক্তি পেয়ে আসছে বহু বছর ধরে। ব্যবসাও করছে কমবেশি। যদিও মাঝে মাঝে এমন খবরও কানে আসে যে উত্তরবঙ্গের কোনও প্রযোজক ছবি করবেন বলে সহযোগিতার আশায় গিয়েছেন কলকাতায় ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ারকার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (এফসিটিডব্লুইআই) অথবা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর (ইম্পা) কাছে। সেখান থেকে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলাকুশলী ও শ্যুটিংয়ের সামগ্রী ভাড়া নেবার জন্য। না হলে তাঁর ছবি কোনও মতেই কলকাতা থেকে সেন্সর করাতে বা হলে চালাতে দেওয়া হবে না বলে ভয় দেখানো হয়েছে। তারপর অনভিজ্ঞ প্রযোজক একশ জনের ইউনিট নিয়ে শ্যুটিং শুরু করলেন বটে। কিন্তু দশ দিন পর দেখলেন তার বাজেটের সত্তরভাগ টাকা শেষ অথচ সিনেমার কাজ দশ শতাংশও হয়নি। অগত্যা শ্যুটিং বন্ধ। কলকাতার কলাকুশলীরা মালপত্র আর দশ দিনের পারিশ্রমিক নিয়ে আনন্দে ঘরে ফিরলেন। এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে। তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ছবি তথা শর্ট ফিল্ম, তথ্যচিত্র ইত্যাদিকে প্রদর্শন ও সম্মান প্রদানের প্রথম ব্যবস্থা করে প্রথম উত্তরবঙ্গ চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি, জলপাইগুড়ি শহরে। ২০০৮ সালে। ২০১২ সাল অবধি প্রত্যেক বছর অনুষ্ঠিত হয় সে উৎসব। চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বরা যুক্ত হন এই প্রচেষ্টার সঙ্গে। বর্তমানে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সিনে সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক বছর; উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবির পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা ও কলাকুশলীদের হাতে। উৎসাহিত হচ্ছেন তাঁরা।

যদিও মাঝে মাঝে এমন খবরও কানে আসে যে উত্তরবঙ্গের কোনও প্রযোজক ছবি করবেন বলে সহযোগিতার আশায় গিয়েছেন কলকাতায় সেখান থেকে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলাকুশলী ও শ্যুটিংয়ের সামগ্রী ভাড়া নেবার জন্য। না হলে তাঁর ছবি কোনও মতেই কলকাতা থেকে সেন্সর করাতে বা হলে চালাতে দেওয়া হবে না বলে ভয় দেখানো হয়েছে। তারপর অনভিজ্ঞ প্রযোজক একশ জনের ইউনিট নিয়ে শ্যুটিং শুরু করলেন বটে। কিন্তু দশ দিন পর দেখলেন তার বাজেটের সত্তরভাগ টাকা শেষ অথচ সিনেমার কাজ দশ শতাংশও হয়নি।

দিপেন টোপ্পো— একটি রুপোলি স্বপ্নের রেখা

মেটেলির এক কৃষক পরিবারের ছেলে দিপেন টোপ্পো। প্রায় পনেরো বছর ধরে উত্তরবঙ্গে সিনেমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত। স্কুলে পড়তে পড়তে চালসা মোড়ে একটা দোকান চালাত দিপেন। প্রাণে গান ছিল, চোখে স্বপ্ন। সেখানে তার গান শুনে দু' একজন তাকে বলেছিল ঝাড়খন্ড চলে যেতে। রাঁচিতে গিয়ে দিপেনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে সংগীত পরিচালক বুবাই রায়ের। সিনেমায় গান গাওয়ার সুযোগ পায় সে। কিছুদিন পর সেখান থেকে মুম্বাই পাড়ি দেয় সে। সেখানে গিয়ে স্পট বয় হিসাবে নতুন জীবন শুরু করে। কয়েক বছর মুম্বাইয়ে কাজ করবার পর নিজের গ্রামে ফিরে আসে দিপেন। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে টেকনিশিয়ান হিসাবে কাজ করতে থাকে সে। চোখে স্বপ্ন নিজের ছবি পরিচালনা করবার। 'তোর বিনা' লেখার কাজে হাত দেয় দিপেন। ছবিটি প্রযোজনা করেন ঝাড়খন্ডের এক প্রযোজক। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন ঝাড়খন্ডের অভিনেতা বিনোদ মাহালি। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় শ্যুটিং হয় ছবিটির। পনেরো লক্ষ টাকা বাজেটের ছবিটি হলে চালাতে প্রচুর বেগ পেতে হয় দিপেনকে। একই সঙ্গে নাগপুরী ভাষায় ঝাড়খন্ডেও মুক্তি পায় 'তোর বিনা'। উদ্বোধন করেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রঘুবর দাস। কিন্তু ডুয়ার্সে কিছুতেই হলে দেখান যাচ্ছিল না ছবিটি। কোনও হল মালিক বা পরিবেশক রাজি হচ্ছিল না সাদ্রি ভাষার ছবিটি দেখাতে। অবশেষে দিপেন নিজেই ঝুঁকি নিয়ে ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে মালবাজারের একটি সিনেমা হলে। প্রায় এক মাস চলে ছবিটি। উঠে আসে নির্মাণের প্রায় সিংহভাগ টাকাই। এরপর একে একে হ্যামিল্টনগঞ্জ, বানারহাট, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি প্রভৃতি জায়গায় প্রদর্শিত হয় 'তোর বিনা'। জলপাইগুড়ি শ্রীদয়াল সিনেমা হলে তিন সপ্তাহ রমরমিয়ে চলে ছবিটি। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ থেকেই প্রায় ষাট লক্ষ টাকা আয় করেছে ছবিটি। দিপেন খুশি। খুশি ডুয়ার্সের সেই সব অভিনেতা ও কলাকুশলীরা যারা এই ছবিতে কাজ করেছিল দিপেনের সঙ্গে।

দিপেন টোপ্পো আজ ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজের এক পরিচিত নাম। হাতে এখন তার সাত-সাতটা আঞ্চলিক ভাষার ছবি। এই বছর 'তোর বিনা' তৃতীয় উত্তরবঙ্গ সিনে সম্মাননা অনুষ্ঠানে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ ছবির তকমা। কিন্তু এখানেই থেমে যেতে চায় না দিপেন! স্বপ্ন দেখে যে দিন তার জন্মভূমি ডুয়ার্সে শ্যুটিং করবে সে এখানকারই লাইট, ক্যামেরা, ট্রলি, লেন্স দিয়ে। কারণে অকারণে ছুটতে হবে না ঝাড়খন্ডে। এখানকার প্রযোজক, হিরো বা হিরোইন দিয়েই ছবি হিট করাতে পারবে সে।

অভিষেক রায়

বোতলের জল পান কতটা নিরাপদ?

সময় এসেছে নিজেদের সচেতন হওয়ার

কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেলে আসছিলাম। ট্রেনে প্রয়োজন হওয়ায় জলের বোতল ফেরিওয়ালার শরণাপন্ন হলাম। প্রথম বোতলটা পাল্টে নিয়েছিলাম, কারণ বোতল এবং সিলের অবস্থা খারাপ ছিল। পরের বোতলটিও তথৈবচ। সহযাত্রী জনৈক ডাক্তারবাবু বললেন 'ভুরু কুঁচকে লাভ নেই। এর থেকে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মের জল অনেক ভাল। খেয়ে নিন, আমরা সর্বংসহা।' মনে পড়ল এর আগে এক বিয়ে বাড়িতে আরেকজন পরিচিত ব্যক্তি খাওয়ার টেবিলে আমাকে জলের বোতল দেখিয়ে বলেছিল ট্রেনে এরকম বোতলের জল খেয়ে কঠিন ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল।

খবরের কাগজে ভাগাড়ের মাংস এপিসোড স্তিমিত হতে না হতেই বোতলের ভরা অথবা জারবন্দি তথাকথিত বিশুদ্ধ পানীয় জল নিয়ে কি আম-আদমি প্রতারিত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কতগুলো সংস্থা কতরকম নামে বোতল ভরা জল বাজারে বিক্রি করছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান কারো জানা নেই, অথচ এর ব্যবসার পরিমাণ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। বিদেশি ও দেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের ছোট উদ্যোগপতিরাও এই ব্যবসায় জড়িত, কারণ এর মূল মন্ত্রই 'বিনিয়োগ কম রোজগার বেশি'।

কুড়ি লিটারের জারে জল সরবরাহের একটি ইউনিটের জন্য দশ লক্ষ টাকায় প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ সংযোগ, মাল বহনের ছোট গাড়ি এবং কার্যকরী মূলধন অর্থাৎ এই টাকায় সম্পূর্ণ প্রকল্পটির রূপায়ন সম্ভব। প্রকল্পটি লাভজনক হওয়ায় ব্যাঙ্ক লোন সহজেই পাওয়া যায়। বোতলজাত জলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এর পরিমাণ বেশি, প্রচুর ডিস্ট্রিবিউটার নিযুক্ত করতে হয়, বাকিতে স্টক সরবরাহ করতে হয়, বাকির টাকা আদায় করতে কালঘাম ছুটে যায়। আর কুড়ি লিটারের জারগুলোর মূল গ্রাহক গৃহস্থ বাড়ি। মাসের শেষে নিয়মিত বিল দিলে পেমেন্ট পাওয়া যায়, ফলে ঝামেলা কম।

তবে দুই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বাস্থ্যবিধি প্রোটোকল অক্ষরে অক্ষরে মেলে চলা। প্রয়োজন গভীর নজরদারি। কিন্তু কোন দপ্তর নজরদারি চালাবেন তা কি নির্ধারিত আছে? প্রথমেই পুরসভাগুলির গুরুদায়িত্ব বর্তায় নজরদারির ক্ষেত্রে। কিন্তু অপ্রতুল লোকবল নিয়ে পুরসভাগুলি সে কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে পারছে কি? ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর অভিযোগ পেলে তদন্ত করতে পারে, প্রয়োজনে থানা-পুলিশ পর্যন্ত করতে পারে। বর্তমানে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর জন-সচেতনতার কাজটি কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু নজরদারির ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য দাগ কাটতে পারেনি।

এসব ইউনিটের কোয়ালিটি কন্ট্রোল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থার নিজস্ব রসায়নাগার থাকা অত্যন্ত জরুরি। উত্তরবঙ্গের কোনও সংস্থাই এমন ল্যাবরেটরি চালু করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। যারা প্ল্যান্ট চালান, জারে জল ভরেন বা বাড়ি বাড়ি ডেলিভারি করেন তাদের

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার, হাতে দস্তানা ও মাথায় টুপি থাকা একান্ত আবশ্যক। প্ল্যান্টের জন্য পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের স্বাস্থ্যসম্মত ঘর দরকার, সেই ঘরটি এবং তার চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটাও জরুরি প্রাথমিক শর্ত। সেই সব বিধি সংস্থাগুলো ঠিকঠাক মানছে কি?

যারা এই ব্যবসায়ে যুক্ত তাদের ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বি.আই.এস)-এর শংসাপত্র প্রয়োজন হয়। যদিও অনেকের মতে এসব সার্টিফিকেটের থেকে নাগরিক সচেতনতা অনেক বেশি কার্যকরী। অনেকে আবার আই.এস.ও.-এর সার্টিফিকেট দিয়ে কাজ সারছেন। আমাকে দু'-একজন উদ্যোগী বলছেন বি.আই.এস.-এর অনুমোদনের জন্য নাকি লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হয়। ওয়েবসাইটে যদিও এমন কিছু বলেনি। এসব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য উত্তরবঙ্গে কোনও সংস্থা এখনও তৈরি হয়নি। ছোট ব্যবসায়ীদের এসব কাজে কলকাতায় ছুটতে হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তারা বাধ্য হয়ে দালালদের খপ্পরে পড়েন।

'অ্যাকোয়া সেফ' ব্র্যান্ড নামে জারের যে জল জলপাইগুড়িতে সরবরাহ করা হয়, প্ল্যান্ট দেখতে তাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম এক রবিবারের সকালে। অভিজিৎ অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সে ওই বাড়ির ছেলে ও উদ্যোগী। ওদের ব্যবসা প্রায় আট বছরের। ৭-৮ জন কর্মচারী কাজ করে। জল সরবরাহ করবার ছোট ভ্যান গাড়ি আছে। তাছাড়া গুঁড়ো মসলার ব্যবসাও চলছে। অভিজিৎ জানালেন জলের ব্যবসা সব অতি শীঘ্রই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে কারণ ওঁদের আই.এস.ও লাইসেন্স আছে কিন্তু সরকার আই.এস.আই. করাতে বলেছে। কিন্তু সেই শংসাপত্র বের করা সহজ নয় মোটেই। শহরে 'অ্যাকোয়া ফ্রেস' ব্র্যান্ড জলের যথেষ্ট সুনাম আছে। এই প্রতিযোগিতার বাজারেও তাদের খদ্দের সংখ্যা যথেষ্ট। পরিবারের বড়রা সবাই রোজগারে যুক্ত, আর্থিকভাবেও ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে অভিজিতের মতে ইউনিটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে এই চাহিদা কমতে বাধ্য, তখন যে ইউনিটগুলো স্বচ্ছল মনে হচ্ছে সেগুলি পঙ্গু হয়ে পড়বে।

পান্ডাপাড়া আট নম্বর গলিতে হাজির হলাম পার্থ কর-এর প্ল্যান্ট। পূর্ব পরিচিত এই যুবককে আগেই বেশ উদ্যমী মনে হত। 'হিমালয়' ওর জলের জারের ব্র্যান্ড নাম। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়েছে, সরকার ২৫ শতাংশ অনুদান দিয়েছে। পরিশোধের চাপ মাথায় নিয়ে ব্যবসা চালাতে হয়। তবে দু'-এক বার পরিশোধে অসুবিধা হলেও ব্যাঙ্কের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইউনিট। যৌথ পরিবার, ভাইরা নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। আই.এস.ও. শংসাপত্র আছে। তবে অভিজিতের মতো পার্থও জানাল বি.আই.এস-এর সার্টিফিকেশন একান্ত প্রয়োজন। বলেছিল সে জন্য লক্ষ টাকার বেশি খরচ লাগবে। যারা প্ল্যান্টে কাজ করছিল তারা মাথায় স্বচ্ছ টুপি এবং হাতে গ্লাভস পরে ছিল। বাড়ির সামনে ৩-৪টি তিন চাকার মোটরভ্যান দাঁড়িয়ে, জার বোঝাইয়ের কাজ চলছিল। পার্থ বলল, আগে জার বাইরে থেকে আমদানি করতে হত, এখন স্থানীয়ভাবেই পাওয়া যায়।

এর আগে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লক অফিসের ভেতরেই মহিলা স্বনির্ভরদলের একটি ক্লাস্টার দ্বারা পরিচালিত পানীয় জলের প্ল্যান্টের কথা বলেছিলাম। ওরাও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। সাত বছর ইউনিট চলেছে, পরিচালনায় মহিলারা, এটাই বড় কথা। শুনেছি প্ল্যান্টে আরও বিনিয়োগ দরকার এবং বিনিয়োগের অপ্রতুলতার কারণে ইউনিটটি ধুঁকছে। এটাও স্বীকার করা উচিত যে ব্যবসায় পেশাদারিত্বের অভাব ছিল।

বোতলজাত জলের ইউনিট উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে চালু আছে। শিলিগুড়িতে বোতলজাত জলের বেশ কিছু ইউনিট রমরমিয়ে চলছে। ছোট্ট জায়গা মেটেলি সেখানে একটি বোতলজাত জলের ইউনিট বেশ নাম কিনেছে। ডুয়ার্সের খুব চালু ব্র্যান্ড। কিন্তু মার্কেটিংয়ের প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। ওদেরও ল্যাব নেই কিন্তু জলের মান যথেষ্ট উন্নত।

আবার ফিরে আসছি ওই সহযাত্রী ডাক্তারবাবুর কথায়। উনি বলেছিলেন "ব্যবহারকারীদের সচেতনতা দরকার। ট্রেনে বহু যাত্রী জল খেয়ে চকচকে বোতলটি অবিকৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যান। ট্রেন থামতেই একদল শিশু দৌড়ে ট্রেনে প্রবেশ করে বোতলগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। ওই বোতল দু'-এক হাত ঘুরে পৌঁছে যায় অসাধু জল তৈরির প্ল্যান্টে, তারা নানা লেভেল মেরে ভেন্ডারদের মাধ্যমে বিক্রি করে। আমরা মনের সুখে 'স্বাস্থ্যকর' জলপান করে তৃপ্তি লাভ করি। আর নানারকম রোগে আক্রান্ত হই"। উত্তরে আরেক একজন যাত্রী বলেছিলেন, 'আমি খালি জলের বোতল মুচড়ে দিই, না হলে ছিপিটা চেপে বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দিই। তাহলে ওই বোতল আর রিসাইক্লিং করতে পারে না'। নানা জন নানা মত জানাতে থাকলেন। শেষে যে সিদ্ধান্তে যাত্রীরা একমত হলেন 'ভোক্তা সচেতন হলেই অসৎ জল ব্যবসায়ীদের রমরমা বন্ধ হবে'।

দুই গ্রাম এক ভোট দুই রাত

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

ভোটের আগের রাতে বউভাত। তার আগের রাতে বিয়ে। বৈশাখের শেষে ডুয়ার্সে ফুরফুরে আবহাওয়ায় দুটি রোমাঞ্চকর রাত্তির উপভোগ করা যাবে দেখে গাড়িতে উঠে পড়লাম।

কোথায়? না। এবার সেটা বলা যাবে না। পাত্রপাত্রীর নামও যে ঠিক বলব, সে গ্যারান্টিও নেই। তবে লোকেশনের আন্দাজ দিতে আপত্তি নেই। ভূখণ্ডটার সীমানা হল, উত্তরে গরুমারার জঙ্গল, উত্তর-পূবে কালিপুর বনবাংলো, পশ্চিমে ময়নাগুড়ি টু লাটাগুড়ির পথ এবং পূবে জর্দা নদী। বেশ শান্ত আর নিরিবিলি পরিবেশ। ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বিয়ে বাড়ির আলো ছাড়িয়ে একটু দূরে গেলেই নিকষ অন্ধকার। নিচু জমিতে

পাটগাছের ছানাগুলো ফুট দুয়েক উঠেছে। তারপর বিরাট বাঁশ ঝাড়ের ভিন্ন মাত্রার আঁধার। হু হু কালোর মধ্যে এদিক ওদিক তাকালে দেখা যাচ্ছে একটা দুটো আলো। আকাশে মেঘ না থাকলে খানিকটা জ্যোৎস্না পাওয়া যেত।

গ্রামের বিয়েতে গ্রামের প্রায় সবাই আসবে। রাত আটটায় দেড় বিঘের বিয়ে বাড়ি জমজমাট। আলো অন্ধকার মাখান পরিবেশে হাঁটাহাঁটি করতে করতে ভাবছিলাম যে কাল বাদে পরশু ভোট —ব্যাপারটা কার সামনে উত্থাপন করা যায়। একটু পরেই এক অচেনা এসে হাসিমুখে জানতে চাইল, কে আমি। পরের মিনিটে বিড়ি বিনিময় করে আমরা খুবই পরিচিত হয়ে গেলাম। চায়ের কাউন্টারের লোকটা এক কেতলি বানিয়ে বসে বসে মোবাইল ঘাঁটছিল এবার সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবারেরটা দাদা বেস্ট বানাইসি কিন্তু কেউ খাসে না!'

মেয়েরা যে হারে লিপস্টিক মেখেছে তাতে চা খাওয়াটা বিপদজনক। আর ছেলেরা আজকের দিনে পানীয় বলতে চা বুঝবেই না। আমি চা-বাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভোটকেন্দ্রে চা বেচবেন নাকি?'

'বুথে? নাঃ! কাল আরেকটা বিয়া আসে।'

সদ্য পরিচিতের দিকে তাকিয়ে এবার বললাম, 'বুথ কি ওই ইশকুলটায়, আসার সময় যেটা দেখলাম?'

'হ্যাঁ। ওটাই তো! ওটাই!'

আর দেরি না করে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'ভোট কী বুঝছেন?'

সদ্য পরিচিতের মুখে একটা বদল ঘটল। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দাঁড়াইসে তো ঘাস আর পদ্ম। গতবার তো ঘাসই জিতসিল।'

গপ্প জমতে লাগল। দু-নম্বর বিড়ি ধরাবার সময় তিনি বেশ সহজ হয়ে জানিয়ে দিলেন যে, দিদির দলই জিতছে। তবে যে বুথের আওতায় বিয়ে হচ্ছে সেখানে জোর লড়াই হবে। আমি শুনতে লাগলাম। এই এলাকায় আমি আগে যে আসিনি তা নয়। রাস্তাঘাট ভালোমন্দয় মেশান। গুটিকয় পরিবারের হাতে অনেক সম্পদ—বাকিটা খুব সাধারণ। বিয়েবাড়িতে অতিকায় সাউন্ড বক্স বিকট রবে বাজিয়ে ঢুস-ঢাস গানের সঙ্গে নাচাটা স্থানীয় বালক-কিশোরদের কাছে বিপুল আনন্দ। অনেক বাড়িতেই টিভি নেই।

বিয়ে বাড়িতে খাসিহত্যার পর মাংসের পরিমাণ হয়েছে আটচল্লিশ কিলো। বাড়ির কর্তা রাত সওয়া ন'টায় হুকুম দিলেন অপেক্ষমান খাসিদুটোকে মাংস বানাবার জন্য। কিন্তু নজরদার কই?

নজরদারের ব্যাপারটা একটু বলা দরকার। মাংসের ছাট আর খাসির মুন্ডু যাতে কেউ না নিয়ে যেতে পারে, তার জন্য একজন নজরদার ছিলেন। তার কড়া নজরদারী এড়িয়ে একজোড়া মুন্ডু তবুও ভ্যানিশ এবং ছাট মাংসের কণামাত্র দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নজরদার বেশ কিছুক্ষণ ধরে উধাও। জানা গেল সে প্রচারে গেছে। গভীর রাতে ফিরবে। পরশু সকালে ভোট। প্রচার তো অফিসিয়ালি বন্ধ! খোঁজখবর একটু নিতে গিয়ে জানলাম, 'প্রচার' শব্দটা এক্ষেত্রে বহুমাত্রিক। একদা রামবাবু আর শ্যামবাবু মিলে শাসক দলকে এই বুথে শক্তিশালী করেছিলেন। তারপর কালের নিয়মে আধডজন হিউম পাইপের বখরা নিয়ে নাকি রাম-শ্যামে মনান্তর। শেষে রামবাবুর বিজেপিগমন। আজ রাতেই নাকি রাম-শ্যামের সশস্ত্র কোলাকুলির সম্ভাবনা আছে।

আমগাছের পাশে জেনারেটর ধ্বক ধ্বক করছে। চল্লিশ ওয়াটের বালব। চেয়ার পেতে তিন-চার জন গুলতানি মারছিল। আমাকে দেখে একটা চেয়ার ছেড়ে দিয়ে একজন বলল, 'আরে! বসেন! চলবে নাকি?'

সুরাপানের অনুরোধ। গল্পগুজব একটু একটু করে জমতে লাগল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ জানা গেল যে আগামীকাল রাতে তো বটেই, আজ রাতেও গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা। এমনিতে এ তল্লাটে সবই শান্তিপূর্ণ। কিন্তু আজ রাত থেকে একটু অশান্তি নাকি হবেই!

আমি বিড়ি ধরিয়ে জানতে চাইলাম, কখন গন্ডগোল বাধবে। জবাবে যা জানা গেল তা অনেকদিন মনে রাখব। যুযুধান দুইপক্ষই নাকি বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। কিন্তু বিয়েবাড়িতে ভোটের গোলমাল লাগাবার কোনও প্রশ্নই নেই। সেটা হবে পাকা রাস্তায়। তাই বরযাত্রীরা আসার পর তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে গন্ডগোলটা নাকি রাত একটার আগে শুরু করা যাবে না! দুটোও বাজতে পারে। তবে বৃষ্টি নেমে গেলে আলাদা কথা। তখন ঘাস-পদ্মে মারপিটটা হয়ত হবে না, কিন্তু গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব হবেই।

পরদিন রাত দশটা নাগাদ একখানা চারশো সাত মার্কা গাড়ি চেপে রওনা দিলাম বউভাত খেতে।

পরশু সকালে ভোট। প্রচার তো অফিসিয়ালি বন্ধ! খোঁজখবর একটু নিতে গিয়ে জানলাম, 'প্রচার' শব্দটা এক্ষেত্রে বহুমাত্রিক। একদা রামবাবু আর শ্যামবাবু মিলে শাসক দলকে এই বুথে শক্তিশালী করেছিলেন। তারপর কালের নিয়মে আধডজন হিউম পাইপের বখরা নিয়ে নাকি রাম-শ্যামে মনান্তর। শেষে রামবাবুর বিজেপিগমন। আজ রাতেই নাকি রাম-শ্যামের সশস্ত্র কোলাকুলির সম্ভাবনা আছে।

গাড়িটাকে যাত্রীঠাসা লোকাল বাসের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে চাঁদের চিহ্ন নেই বরং হঠাৎ হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘনগভীর অন্ধকার চিরে বাসটা গুড়গুড় করে চলছে। কখনও মসৃণ কখনও গর্তসঙ্কুল পথে দুলতে দুলতে যাওয়া। তারপর আরেকগ্রামের বিয়েবাড়ি। নিমন্ত্রিতরা খেয়েদেয়ে চলে গেছে। ফাঁকা প্যান্ডেলে বরপক্ষ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভোটের আগের রাত বলে সকলেই চাইছেন সব কিছু তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।

বিয়ে বাড়ি থেকে কয়েক পা হাঁটতেই চোখে পড়ল জোর পিকনিক হচ্ছে। শাসক দলের ক্যাম্প। আমি হাঁটতে লাগলাম। অসাধারণ আবহাওয়া। ঘুটঘুটে প্রান্তরে হু হু হাওয়া। মনে হল, এখানে উত্তেজনা নেই। বিয়ের ঘটককে বললাম, 'বিজেপির ক্যাম্প নেই?'

'উয়াদের ট্যাকনিক আলাদা। এই বুথে সিপিএমরা উয়াদের সাপোর্ট দিসে।'

তারপর আবার শান্তিপূর্ণ একঘন্টা কাটিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন বরবউ-এর ছবি তোলা হচ্ছে, চারশো সাতের লোক হঠাৎ তাড়া দিতে শুরু করল। গন্ডগোল লেগে গেছে। চটপট ভেগে পড়তে হবে। দেখলাম, ক্যাম্প আপিসে বেশ উত্তেজনা। এগিয়ে গিয়ে দেখি কারণটা কিঞ্চিৎ আলাদা। লাঠি হাতে চার পাঁচজন অপেক্ষা করছে একজনের জন্য। সে ত্রিপলে লোকনাথবাবার আসনে বসে। সামনে একখানা বাঁশের লাঠি। কিন্তু তুরীয় মেজাজের কারণে তিনি উঠছেন না। তাঁর সাফ বক্তব্য, গিয়ে পেটাতে পারবেন না। এখানে ধরে আনা হোক।

মিনিট পাঁচেক রঙ্গের পর বাকিরা তাঁকে ছাড়াই বাইকে চেপে কোথায় জানি চলে গেলেন।

গাড়িওয়ালা তাড়া দিলেও কনেপক্ষের বিশেষ বিচলন দেখা গেল না। মারপিট তো নেতায় নেতায় হবে। কনেপক্ষের কী? শেষে রাত দেড়টার সময় অনিচ্ছে সত্ত্বেও গাড়িতে চাপা হল। ক্যাম্প অফিস ফাঁকা। একজন মহিলা কেবল পিকনিকের বাসন ধুচ্ছেন। গাড়ি কিলোমিটার খানেক চলতেই কানে এল হৈ হল্লার শব্দ। বিয়েবাড়িতে প্রবল রবে সাউন্ড বক্স বাজছিল বলে এসব এতক্ষণ কানে আসেনি বোধহয়। গাড়িওয়ালা বললেন, আমরা যে রুট দিয়ে যাব সেই রুটেই ক্যাচাল লেগেছে।

কথা শেষ করেই তিনি গাড়ির আলো সব নিভিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিট পর একটু ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থমকে দাঁড়াল। হেডলাইটে দেখা যাচ্ছে সামনে এক পতাকা শোভিত বাইক। একমাত্র আরোহী উচ্চস্বরে ড্রাইভারকে কিছু বলছে। তাই দেখে গাড়ির ভেতর থেকে কে জানি দেশি ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'নেতা নাকি? ধর তো ব্যাটাকে!'

বাইক থেকে নেতা জড়ান গলায় বললেন, 'বিয়ার গাড়ি নাকি? সবাই তো সাগাই! যান যান!'

গাড়ি চলতে শুরু করল। আবার শুনতে পেলাম কোথায় জানি বেশ কোলাহল হচ্ছে। কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই। আরও মিনিট পনের চলার পর সব শান্ত হয়ে এল। গাড়ির ইঞ্জিন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। একবার শুধু গাড়িটাকে অতিক্রম করে তিন চারটে বাইক পর পর কোথায় জানি ছুটে গেল। একটা স্কুলবাড়ির ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে।

রাত আড়াইটে নাগাদ সে গ্রাম থেকে এ গ্রামের রাস্তায় এসে দেখি সব শান্ত।

পরদিন এ গ্রামের ভোট দেখতে বুথে গেলাম। দিব্যি চলছিল সব কিছু। যুযুধান দুইপক্ষই হাজির। সামনেই বাজার। এদিক ওদিক সময় কাটিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে দেখি গতরাতের বাসওয়ালা। তাড়া দিয়ে বরের বাড়ি থেকে আমাদের বের করে নিয়ে আসার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমাদের কিসু হতো না। তবে উয়াদের একটু সমস্যা হচ্ছিল।'

'বরপক্ষের সমস্যা?'

'না দাদা! বরের কি সমস্যা। আসলে আপনেরা থাকতে ক্যাচালটা হচ্ছিল না!'

'মানে?'

রহস্য জানলাম। বাসভর্তি সাগাই এসেছে গ্রামের মানি লোকের বাড়িতে বউভাত খেতে। তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত মারপিট-ঝামেলা শুরু করা যায় কখনও? তাই বাস রওনা করিয়ে দেওয়ার পর বাইক বাহিনী দিয়ে নজর রাখা হয়েছে যে সেটা গ্রামের সীমা পেরিয়ে গেল কি না। দুইপক্ষই রেডি হয়েছিল। আমরা যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক নাকি খুব ক্যাচাল হয়েছে সেখানে। তবে কেউ জখম হয়নি। ভোট নিরুপদ্রবেই ঘটছে।

সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চায়েত ভোটের গন্ডগোল আর রক্তপাতের খবর ততক্ষণে টিভিতে ভাসতে শুরু করেছে। দোকানদার 'ধেত্তেরি' বলে চ্যানেল বদলে বাংলা সিনেমা চালিয়ে দিলেন।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সিঙ্কোনা স্যালামান্ডার সেলপু

একসময় এ পাহাড়ের সিঙ্কোনা চাষ মারণ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করত ডুয়ার্সের মানুষকে। আজ সে সিঙ্কোনার কদর নেই, অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকে পথের দুপাশে, রক্ষা করতে ভুলে গিয়েছি আমাদের এই হেরিটেজ। আরেক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণ স্যালামান্ডার অবশ্য সংরক্ষিত হচ্ছে এই পাহাড়ের নিভৃতে। গত সংখ্যায় গৌতম চক্রবর্তীর প্রতিবেদন 'লাটপাঞ্চার'-এর পর এবার এই পাহাড়ের আরেক ঠিকানা সেলপু।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া সফর একটা। আসলে টানা কিছুদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারির অফিস আর বাড়ির প্যাঁচপ্যাঁচে পরিবেশে বন্দি থাকতে থাকতে দম যখন বন্ধ হয়ে আসে তখনই বাড়ির ভোঁতুদেরকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভোঁতু নামটা আসলে আমার অর্ধাঙ্গিনীর পাড়াতুতো ডাক নাম 'ভোঁতা' থেকে আদর করে নেওয়া, এবার ওই নামটাই থাক। তা বাকিদের মতো প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে বেড়াতে যাওয়া আমাদের কস্মিন কালেও হবে না। যেমনভাবে সাধারণত শুক্রবারগুলোতে বিকেলে বেরিয়ে পড়ি, শনিবার থেকে রোববার ফিরে আসি তেমনিভাবেই চলে গেলাম সেলপু। ফিরে এসে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় লাটপাঞ্চারের গল্প পড়লাম। বেশ লাগল। যে আহালডারায় দাঁড়িয়ে শোভা দেখে লাটপাঞ্চারে বেড়াতে যাওয়া পর্যটক সেই আহালডারাতেই সূর্যোদয় দেখতে যায় সেলপুর টুরিস্টরাও। আমরাও গিয়েছিলাম।

সেবকের পথে কালিঝোরা থেকে আরও খানিকটা এগোলে বিরিকডারা মোড়। সেখান থেকে বাঁ দিকে খাড়া রাস্তা উঠে গেছে সেলপু পর্যন্ত। সেলপু থেকে আরও এগোলে ৫ কিলোমিটার পর লাটপাঞ্চার। আমরা মালবাজার থেকে ওদলাবাড়ি হয়ে সেবকে পৌঁছলাম বেলা তখন বারোটা। ওদলাবাড়ির পর থেকে রাস্তার দু'ধারে বাঁদরের আড্ডা। আমার দুই ছানা তাদের পূর্বপুরুষদের দেখে উত্তেজিত। মায়ে-ছায়ের ক্রমাগত বকবকানির যুদ্ধে মাঝে মাঝে বিরক্ত হই ঠিকই কিন্তু আবার ওই যে, গাড়ির ভেতর কিচিরমিচির না থাকলেও মন দিয়ে ড্রাইভ করতে পারি না। করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরলাম। বাঁ হাতে চলে গেল শিলিগুড়ি। একটু যেতে না যেতেই পড়লাম বিশাল লম্বা গাড়ির লাইনের লেজে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল আরও গোটা পঞ্চাশেক। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। সমতলে এই অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। তাই প্রমাদ গুনলাম। কিন্তু এ-ও জানি পাহাড়ের জ্যামে অসভ্যতা নেই। দুম করে লাইন ব্রেক করে তিন নম্বর লাইন বানিয়ে ফেলা কিংবা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটতে গিয়ে জ্যামটাকে আরও ঘেঁটে ঘ বানিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এখানে একেবারেই নেই। ফলে শম্বুক গতিতে হলেও এগোতে লাগলাম। এগোতে এগোতে খানিক বাদে বুঝলাম সামনে কালভার্ট বানানোর কাজ চলছে। মেন অ্যাট ওয়ার্ক। তাই এই সাময়িক সমস্যা।

কালিঝোরা পর্যন্ত যেতে যেতে একটা দৃশ্য দেখে খুব কষ্টে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। ভরা তিস্তার যে রূপ আমরা দেখে অভ্যস্ত তা কই! একটা নদীর তার নিজের খুশি মতো বয়ে চলবারও অধিকার নেই! কালিঝোরায় পৌঁছে দেখলাম হ্যাঁ, ঠিকই তাই, আটকে রাখা হয়েছে জল। হায়রে মানুষের সভ্যতা আর উন্নয়ন! নদী আপন বেগে বইতে পারবে না, অরণ্য নিজের মতো বাড়তে পারবে না, মাটি তার সম্পদ আগলে রাখতে পারবে না, সমুদ্র লুকিয়ে থাকতে পারবে না, অথচ আমরা পলিব্যাগ ব্যবহার করব, জল অপচয় করব, অরণ্য ধ্বংস করে প্রাণীকুলকে অতিষ্ঠ করে মারব, নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করব আমাদের ইচ্ছে মতো, পারলে প্রাকৃতিক সম্পদকে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসের মতো পুরোটাই পেট থেকে টেনে বের করে এনে নিজেদের ভোগে লাগিয়ে দিই আরকি। তাই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা! হঠাৎ দুম করে লাফিয়ে উঠলাম এক হাত। পাশের সিট থেকে দাঁত খিঁচুনি, উফ্ দেখে গাড়ি চালাতে পার না? আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, আমি কী করব? উন্নয়ন। উন্নয়নের আর এক নাম বাম্প। আমার কী দোষ? মুখ ঝামটা মেরে আবার পাশের সিট থেকে ভোঁতুর খেঁকুরে প্রশ্ন, চোখের আর এক নাম কি তাহলে কানা হলো? চুপ করে গেলাম। কারণ গাড়ি চালাতে চালাতে বাম্প খেয়াল না করাটা আমার অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটা।

কালিঝোরা থেকে বিরিকডারা মোড়ে পৌঁছলাম। দোকানি দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলাম, 'ভি' অক্ষরের মতো খাড়া উঠে গেছে একটা পিচ-রাস্তা। উউউউউ করে আওয়াজ তুলে গাড়ি উঠল এক নম্বর গিয়ারে। পাহাড়ে প্রচুর গাড়ি চালিয়েছি এর আগে। পাংখাবাড়ির এমন ঠাকুর্দা এর আগে একমাত্র পেয়েছিলাম ডালিমটারে। সঙ্গে বউ-বাচ্চা থাকলে পুরুষ মানুষের

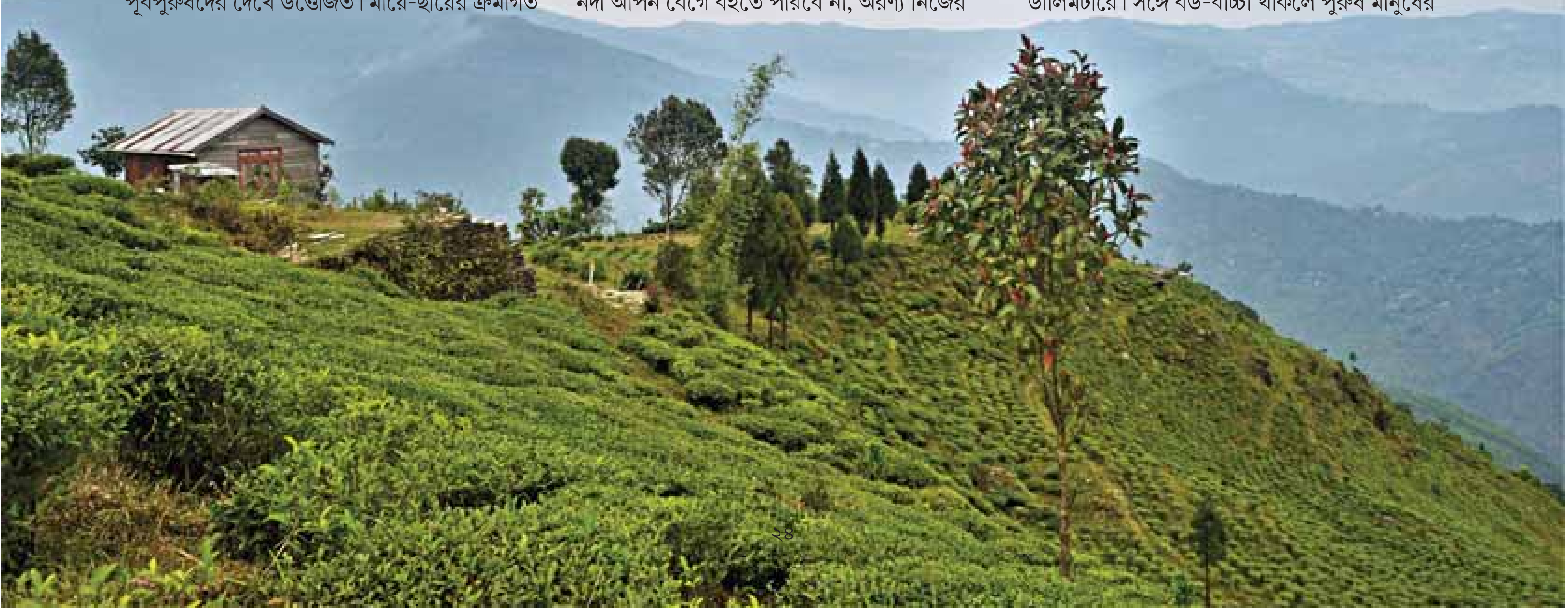

পত্রিকা রাইয়ের হোম স্টে-র নম্বর - ৯৭৩৪৫৫১৪৭৫

কী চাপ তৈরি হয় সে তখন আমার চাইতে ভাল আর কে বুঝতে পারবে। যদিও সেটা চেপে রাখলাম ভেতরে, নারীবাদী ভোঁতু আবার রে রে করে উঠবে। মনের চাপ মনে রেখেই শাল বনের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম। অপূর্ব সে রাস্তা। মন জুড়োনো। হলুদ শুকিয়ে যাওয়া পাতায় ঢেকে আছে মাটি। কোথাও কোথাও তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে গ্রামবাসী। একটা ময়লা নেই সারাটা পথে। একটা প্লাস্টিক চোখে পড়ল না এ পর্যন্ত। পোলাপানদের মা মুখ বুজে বসে আছে পাশে। বুঝতে পারছি চাপে আছে মালটা। তা না হলে এমন মুখ বন্ধ করে থম মেরে যাওয়াটা ওর পক্ষে জাস্ট অসম্ভব। সেলপুর এই পরিচ্ছন্ন আর চকচকে মসৃণ পথে চলতে চলতে ভুলে গেলাম তিস্তার কষ্টের কথা।

বিরিকডারা থেকে সেলপু ন' কিলোমিটার মতো। কাছাকাছি পৌঁছে যাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'পত্রিকা রাই কা ঘর যানা হ্যায়', সে-ই আনন্দের সঙ্গে দেখিয়ে দেয়। অবশেষে হোম-স্টে-র সামনে যখন পৌঁছলাম পত্রিকা রেলিং-এ গা হেলিয়ে অপেক্ষাই করছিল আমাদের জন্য। ভোঁতুর সঙ্গে ওর চোখাচোখিতেই চেনাচেনির পর্ব মিটে গেল। তবু রক্ষে। এই যদি চোখাচোখিটা আমার সঙ্গে হত তাহলে অগ্নিউত্তাপ দৃষ্টি আর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি দিয়ে আমার যে কী হাল হত! না হোক বার কয়েক এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে বটে। কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে? 'আহাল হোম-স্টে'। গাড়ি পার্ক করে দোতলার ঘরে উঠে গেলাম আমরা। আমাদের জন্য বরাদ্দ ঘরে লাগেজ উঠিয়ে বিছানায় বসে জিরোলাম খানিক্ষণ। স্নোপি নামে একটা লোম-ঝুমঝুম কুকুরও এ বাড়ির বাসিন্দা। আমার ছা দু'জন একটুও সময় নষ্ট না করে অবশ্যই চলে গেল ওর পিছুপিছু। খানিক বাদে জানালা দিয়ে চোখ গেল বাইরে। আর তো ফেরাতে পারি না সেই দৃষ্টি! পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়ের সারি। তাতে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর, রাস্তার বাঁকে ছোট্ট ছোট্ট গাড়িগুলো যেন খেলনা সব। মজার কথা হল, কতবার যে এ পাহাড় সে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, অথচ প্রতিবারেই নতুন রূপ দেখতে পাই এই সুন্দরীর। প্রতিবারেই নতুন করে রোমাঞ্চ লাগে। ড্রাইভিং-এর অভিজ্ঞতা আবার অন্য রকম, প্রতিটা বাঁকের ওপারেই অজানা কিছু অপেক্ষা করছে, সেটাই রহস্য তৈরি করে। আর প্রতিটা বাঁকের রহস্য উন্মোচন করতে করতে যাওয়ার একটা অন্যরকম অনুভূতি।

লাঞ্চ সেরে বারান্দায় খানিকক্ষণ বসতে বসতেই সূর্য পাটে নামল। নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশের এমন অপূর্ব রঙের খেলা দেখার সৌভাগ্য যত দূর মনে পড়ছে এই প্রথম। বালিশে চিবুক রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ভোঁতু আর আমি ব্লেন্ডার্স প্রাইড ঢালছি গ্লাসে। সামনে উন্মুক্ত কপাট। আকাশকে যেন হাত দিয়ে ধরে ফেলতে পারব, এই তো, সামনেই। পাহাড় চূড়ার পেছনে মুখ লুকোচ্ছে সূর্য। লাল আঁচল উড়িয়ে পাহাড়ের

সঙ্গে আমাকেও যেন ঢেকে নিচ্ছে আকাশ। ঘরের আলো জ্বালানো হয়নি এখনও। কোথায় যেন হারিয়ে যেতে লাগলাম আকাশ-পাহাড়ের হাত ধরে। ভোঁতু একবার আমার দিকে তাকাল। 'কী দেখছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কিছু না' বলল বটে কিন্তু দৃষ্টি সরালো না। ধীরে ধীরে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমিও জাপটে নিলাম ওকে। এমন বন্ধু আর কে আছে? সত্যিই সময়টা বড়ই প্রেমময়। আলিঙ্গনাবদ্ধ আমরা দু'চোখ ভরে সন্ধে নামতে দেখলাম। হঠাৎ দরজায় বেমক্কা ধাক্কা, দুম দুম। উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি আমাদের ন'বছরের কন্যা 'হাগু, হাগু' বলে এই করে ফেলে আর সেই করে ফেলে অবস্থায় দৌড়ে একেবারে বাথরুমে। আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম। ভোঁতুও হেসে বলল, 'হায়রে আমাদের প্রেম! এই তার পরিণতি'?

পরদিন পত্রিকা সকাল বেলা এসে বলল, দিদি, আপনারা তো আশপাশে বেড়াতে যাবেন, আমার মেয়ে আপনাদের নিয়ে যাবে দেখাতে। আপনাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে আমি একটু শিলিগুড়ি যাব আজ। তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ ফিরে আসব। একটু কষ্ট হবে হয়ত আপনাদের। ভোঁতু দিদিমণি বলল, না না, কোনও অসুবিধে হবে না। ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্তে যাও। পত্রিকা আর ওর হাসব্যান্ড দুজনেই বেরিয়ে গেল আমাদের সকালের জল-খাবার দিয়ে। পত্রিকার মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ছুটি কাটাতে বাড়িতে এসেছে। শিলিগুড়িতে হোস্টেলে থেকে পড়ে। রতি রাই নাম ওর। খুব মিষ্টি মেয়ে একটা। ভোঁতু, পত্রিকার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে বলল, 'আমি হলে কি মেয়েকে একলা বাড়িতে অন্য অচেনা অজানা গেস্ট-এর সঙ্গে ছেড়ে রেখে যেতে পারতাম? এমনকি এই কচি বাচ্চা অবস্থাতেও? কেন পারতাম না বলত? ও মা হয়ে আমাদের বিশ্বাস করতে পারল আর আমি পারতাম না কেন?' আমি উত্তর খুঁজে পেলাম না। কেবল বললাম, 'ও আমাদের বিশ্বাস করল। এটা আমার সৌভাগ্য'। নিজেকেই নিজে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আমিও মনে মনে ভাবলাম, আমার এই অবিশ্বাসী মন কবে থেকে তৈরি হয়েছে তা আমি নিজেও জানি না। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। মেয়ের বাবা হয়েও তো আমি অন্য বাবাকে বিশ্বাস করতে পারব না! কেন এমন হল! মনে মনে ভাবলাম কত শান্তিতে আছে এই পাহাড়ি মানুষগুলো। ওদের মাথাতে এসব অঘটন ঘটার সম্ভাবনার চিন্তাটাই নেই। পরিবেশ আমাদের কত জটিল বানিয়ে দিয়েছে। এমন সহজই যেন থাকতে পারে ওরা।

রতির সঙ্গে চললাম আহালডারায়। গাড়ি চালালাম এই কিলোমিটার খানেক। একটা পাহাড়ের মাথা এটা। কয়েকটা রিসর্ট আছে এখানে যার মালিক থাকেন লাটপাঞ্চারে। রতি রিসর্টগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলা আমার পাপা কা বাই কা'। ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে ইচ্ছে করছিল গাল টিপে আদর করি একটা। এত মিষ্টি মেয়ে রতি, ভাল না বেসে পারা যায়! কিন্তু পারলাম না। পাছে 'খারাপ লোক' প্রতিপন্ন হই। বিরত হলাম। টিলার মাথা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে চা-বাগান গড়িয়ে গেছে সামনে। একটু পরেই বিশাল খাদ। একটা পাহাড়ের টপে দাঁড়ালে অন্য পাহাড়গুলোকে এত সুন্দর লাগে যে ইচ্ছে করে দেখতেই থাকি দেখতেই থাকি। কিন্তু প্রকৃতি যদি বাধা দেয় তাহলে মন খারাপ করা ছাড়া হাতে আর কিছুই থাকে না। রোদ্দুর উঠল না সেদিন। হালকা কুয়াশায় ছেয়ে আছে পাহাড়ের সারিরা। ফটো তুলতে পারছি না বলে মুডটা অফ হল একটু। তবুও তারই মধ্যে বেশ কিছু তুললাম।

আহালডারা থেকে রতি আমাদের নিয়ে গেল স্যালাম্যান্ডার দেখাবে বলে। আমরা জানতামই না যে এখানে এমন সংরক্ষণ শিবির তৈরি হয়ে রয়েছে ওদের জন্য। শুনেই মনে হল, ভাগ্যিস মনুষ্য প্রজাতি থেকে দূরে আছে এটি, তাই বেঁচে-বর্তে আছে বোধহয়। যেখানে পৌঁছলাম জায়গাটা ঠিক যেন ফরেস্ট। বসতি কম। কয়েকটা ঘর। একটা ছোট্ট দোকান। ব্যাস্। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচের দিকে নেমে গিয়ে একটা ঝিল। ঝিলে এসময় জল নেই খুব একটা। শ্যালো মিডো টাইপ মনে হচ্ছে যেন। রতি বলল, আর কিছুদিন বাদেই জলে ভরে যাবে ঝিল। বড় একটা গেট, বন্ধ। বাইরে নোটিশ ঝুলছে। তাতে লেখা, ঢোকার কোনও অনুমতি নেই। সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও চলে এখানে, এমনকি স্যালাম্যান্ডারের ব্রিডিং হাউসও বটে। যিনি এটির দায়িত্বে আছেন তিনি থাকলে হয়ত ছোট্ট মিষ্টি স্থানীয় মেয়ে রতির আবদার রাখতে একটু আশপাশ থেকে দেখার ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু তিনিও

বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ। প্লাস্টিক নেই, আবর্জনা নেই, বোতল নেই, সর্বোপরি নেই মানুষের উচ্চগ্রামের কর্কশ কণ্ঠস্বরের খিচুড়ি। ফেরার পথে ভাবছিলাম, ইকো পর্যটনের গোড়ার কথা যদি হয় 'সংরক্ষণ', তাহলে আমাদের পাহাড়ে সেলপু আজকের এক আদর্শ ইকো-পর্যটন কেন্দ্র নিঃসন্দেহে। এগুলিকে শহুরে দত্যি-দানোদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্তত টানা তিনটে বছর ইকো-পর্যটনকে 'শিক্ষামূলক সফর' করে রাখা বাধ্যতামূলক!

সেদিন শিলিগুড়িতে গিয়েছিলেন কাজে। মনটা একটু খারাপ হল ঠিকই কিন্তু পরমুহূর্তেই ভোঁতুর একটা কথাতে পালটে গেলাম আমি। ও বলল, 'দেখতে না পাওয়াই মঙ্গলের, ওরা ওদের মতো থাকুক নিশ্চিন্তে। তা ঠিক, ভাবলাম আমিও। সমস্ত পরিবেশটাতে একবিন্দুও অসভ্যতার ছাপ নেই। বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ। প্লাস্টিক নেই, আবর্জনা নেই, বোতল নেই, সর্বোপরি নেই মানুষের উচ্চগ্রামের কর্কশ কণ্ঠস্বরের খিচুড়ি। ফেরার পথে ভাবছিলাম, ইকো পর্যটনের গোড়ার কথা যদি হয় 'সংরক্ষণ', তাহলে আমাদের পাহাড়ে সেলপু আজকের এক আদর্শ ইকো-পর্যটন কেন্দ্র নিঃসন্দেহে। এগুলিকে শহুরে দত্যি-দানোদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্তত টানা তিনটে বছর ইকো-পর্যটনকে 'শিক্ষামূলক সফর' করে রাখা বাধ্যতামূলক!

রতিকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। ছানাগুলো ঘরে না এসে স্নোপির সঙ্গে আদাড়ে বাদাড়ে চলে গেল। আমার তো মনটা ছুকছুক করছে। বেলা বাজে বারোটা। লাঞ্চ করতে করতে দেড়টা দুটো। ঘণ্টা দেড়েক রঙিন পানীয় সেবন করলে মন্দ কি? টুকটুক করে ঢাললাম দুটো গ্লাসে। ভোঁতু একটু দোনমনা করছিল, ভর দুপুরে আমিও? আমিই উস্কে দিলাম। বললাম, এই তো মজা। কাজ নেই কম্ম যখন নেই মস্তিতে থাকো। আড্ডা মারতে লাগলাম দু'জনে। এ গল্প থেকে সে গল্প, গরু একেবারে গাছে। ছেলেমেয়েকে বলে দিলাম, 'এখন ঘরে আসবি না খবরদার'। বেচারা মেয়ে বলল, 'বাবা, আবার যদি হাগু পায়?' বললাম, 'করবি না। চেপে থাকবি'। 'তাহলে কখন ঘরে আসবো বাবা?' 'আমি যখন ডাকব তখন'। 'তোমরা এখন কী করবে বাবা?' 'বাবা' ডাকের ঠেলায় আমার দুরবস্থা দেখে ভোঁতু মিচকি মিচকি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি বললাম, 'আমি আর মা গল্প করব এখন'। 'ও আচ্ছা ঠিক আছে'। মনটা একটু ঝিমিয়ে চলে গেল ঠিকই কিন্তু বাবা কেন আবার মায়ের সঙ্গে গল্প করবে সেটা ঠিক ভাল চোখে দেখল না। এই একটা জায়গাতেই আমার ওপর যত রাজ্যের হিংসে ওর।

মিনিট কুড়ি যেতে না যেতেই হাওয়া দিয়ে উত্তাল এক চোট বৃষ্টি এল। চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ওদিকের পাহাড়ের কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। উফ্ কী অপূর্ব অনুভূতি! যারা বাইরে বেড়াতে না পারলে মুষড়ে পড়ে আমরা সে দলে পড়ি না। আমরা দু'জনে আড্ডা মেরে সময় কাটিয়ে দিতে পারি দিব্যি। ফলে বৃষ্টিতে মন খারাপ হল না একটুও। ভোঁতুকে বগলে নিয়ে জম্পেশ করে দাঁড়ালাম জানালায়। ভোঁতু বলল, 'কি গো বাচ্চাগুলো কোথায় একটু খোঁজ নেবে না?' আমি হাঁক পাড়লাম নাম ধরে। দেখলাম, কাক ভেজা হয়ে একটা এসে দাঁড়াল সামনে। আমি ফ্যাক করে হেসে দিলাম আর ভোঁতু ছুটল টাওয়েল নিয়ে মোছাতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর একজন কই? বোন?' সে বলল, 'নিচে, ঘরের ভেতর বসে আছে, দিদির সঙ্গে'। যাক্, বড়টাকে মোছানো হওয়ার পর সবেমাত্র বসেছি আর এক পেগ বানাবো বলে, ওমনি ছোটটি এসে হাজির। আমার রং ততক্ষণে টঙে। ঘরের মধ্যে হুল্লোড়, লাফালাফি, ঝাপাঝাপি তাণ্ডব। বৃষ্টিতে রোমান্টিক হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। ঘাড়ে চড়ে চুল টেনে আমাকে নাজেহাল করে দিল দুটোতে মিলে। হে ভগবান! কোথায় আমার হুইস্কির রস, সবই চচ্চড়ি মনে হচ্ছে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেরার আয়োজন। এবার অনেকটা রিলাক্স মুডে। পৌঁছনোর তাড়া নেই। সকাল থেকেই ভোঁতু কেন যেন মুখটা হাঁড়ি করে রেখেছে। বললাম, 'কী হয়েছে রে? পেঁচির মতো মুখ করে রেখেছিস কেন?' বলল, 'কিছু না। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না'। 'অ, এই ব্যাপার? তা একটা চুমু খেয়ে দিই, মুড ঠিক হয়ে যাবে'। এক ঝটকায় সরিয়ে দিল আমাকে। যাঃ শালা। সরে গেলাম ঠিকই কিন্তু কাজ হল। মুডটা ফিরে এল। লাগেজ-পত্র নামিয়ে রওনা হওয়ার সময় পত্রিকা হ্যান্ডশেক করল ভোঁতুর সঙ্গে। কুশল বিনিময় হল দুজনের। শেষমেশ গলাগলিও। আমি শুধুই দর্শক-শ্রোতা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবলাম, পুরুষ বলে আমরা কি মানুষ না? সি অফ পর্ব সমাধা করে আমার দিকে মুখ ফেরাল ভোঁতু 'কী ভাবছিলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আমি ধরা পড়ে যাওয়া বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে ভাবলাম, হায়রে! আমার আর কিছুই ব্যক্তিগত থাকল না। পরমুহূর্তেই কঠিন বউসুলভ আচরণ করে বুঝিয়ে দিল এখন আমাদের রওনা হওয়া দরকার। আমি তো চিরকালীন ড্রাইভার। অতএব গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে কাঁইকিচিরসমেত গমনে উদ্যত হলাম। আবার সেই পিণ্ডির জীবনে প্রবেশ।

মগ্নমৈনাক মৈত্র

মনীষিতার গান আশ্বাস দেয় মনে কোথাও পিছিয়ে নেই আমরা

জলপাইগুড়ির 'আড্ডাঘর'-এর তৃতীয় জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে সেদিন ঘরভর্তি শ্রোতা বাকরুদ্ধ হয়ে শুনেছিল ওর গান। সুরের বাণ ডেকেছিল সেদিন। আসছে দিনগুলিতে এই তরুণীর পরিচয় যে একজন উচ্চমানের শিল্পী হিসেবেই হবে তা বলাটাই বাতুলতা। জলপাইগুড়ির মেয়ে মনীষিতা নন্দীই আজকের শ্রীমতি ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের নয়া প্রজন্মের মুখ।

মায়ের কাছে গানের সঙ্গে পরিচয় মনীষিতার। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ই মা বুঝতে পারেন এবার উপযুক্ত তালিমের দরকার। জলপাইগুড়ির বর্ষীয়ান সঙ্গীত-গুরু শ্রী চিন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে নাড়া বাঁধা সেই ছোট্ট বেলাতে। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে গানের জগতে বিচরণ করার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায় মণিষীতা। প্রথাগত তালিমের মাধ্যমে এলাহাবাদ ঘরানায় সঙ্গীত বিশারদে ষষ্ঠ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় অল্প বয়সেই। ঠাকুর্দা পূর্ণেন্দু নন্দী ছিলেন অবিভক্ত দিনাজপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষক। সাহিত্যিক জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পর্কে মামা-ঠাকুর্দা। রঞ্জাবতী সরকার এবং মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার পিসি-দিদা। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত মনীষিতার মজ্জায় মজ্জায়, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

নাটকটাও ছিল রক্তে। দাদামশাই ছিলেন কোচবিহারের নাম করা নাট্যব্যক্তিত্ব নীরজ বিশ্বাস। ফলে নাটকের প্রতিও মেয়ের অদম্য উৎসাহ জন্মগতভাবেই। জলপাইগুড়ির কলাকুশলীতে অমল ও ডাকঘর নাটকে অমলের চরিত্রে অভিনয় করে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আন্তঃবিদ্যালয় প্রতযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হিসেবে পুরস্কার পায় সে। গানও চলছিল পাশাপাশি। আর্যনাট্য সমাজ আয়োজিত কলা প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়ির গানের জগতের ঐতিহ্য। সেরার সেরা শিল্পী তথা প্রতিযোগী হিসেবে নিজের নাম খোদাই করা রুপোর বীণা জিতে নিয়েছে মনীষিতা। পুরস্কারের ঝুলি পূর্ণ করা নিয়ে আর ভাবতে হয়নি এরপর। সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন উদয়-সঙ্ঘ ক্লাবে আয়োজিত প্রতিযোগিতাতেও মেলে সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর তকমা।

নাটকে যেমন শরীরী ভাষার প্রয়োজন কণ্ঠ সঞ্চালনাও তেমনিই জরুরি। মনীষিতা তার কণ্ঠটিকে ব্যবহার করেছে নানা ভাবে। নাটক আর গানের সঙ্গে আবৃত্তিতেও প্রয়োগ করেছে সেটিকে। আবৃত্তি করে শহর ছাড়িয়ে জেলা স্তর এমনকি রাজ্য স্তরেও তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছে এই সঙ্গীত শিল্পী। বলা যেতে পারে বহুমুখী প্রতিভার একটি বড়সড় আধার এই মনীষিতা। শেষমেশ গানকেই বেছে নেওয়া। প্রধানত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপরেই ঝোঁক বেশি। তবু নজরুলগীতি, ভজন আর সেই সঙ্গে রাগ-সঙ্গীত তো আছেই। নজরুলগীতি প্রতিযোগিতায়ও রাজ্যস্তরে পুরস্কার।

মনীষিতা নন্দী

লেখাপড়াতেও এই ডুয়ার্স-কন্যা পিছিয়ে নেই। ভাল ফল করে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় থেকে। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করতে করতে ভাল লাগার বিষয় হয়ে উঠেছে রসায়ন। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে মূল বিষয় হিসেবে রয়ে যায় এই রসায়নই। বিএড ও করে নেয় এরপর। 'আমার নিজের বিষয়ও আমার খুব প্রিয়', বলছিল মনীষিতা। ফলে সব পরীক্ষাতেই ভাল নম্বর। এখন নিজের শহরেরই একটি ইংরিজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা। পড়াতেও খুব ভালবাসে। ওখানেও অবহেলা নেই।

এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগসঙ্গীতের অধ্যাপিকা তথা বিভাগীয় প্রধান রাজশ্রী ঘোষের কাছে চলছে রাগসঙ্গীতের তালিম এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা। ইতিমধ্যেই অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সাগরিকা মিউজিক থেকে 'স্মৃতি জাগানিয়া' সিডি তে গান গেয়েছে মনীষিতা। অনেক এগিয়ে চলা এখনও বাকি। 'গানটাকে আরও ভালভাবে গাইতে চাই, আরও অনেক শিখতে চাই', এটাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান এখন তার। তারা মিউজিক টিভি চ্যানেলের অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'আজ সকালের আমন্ত্রণ'-এ ডাক এসেছিল গান শোনাবার। জলপাইগুড়ির বিদগ্ধ মহলের স্থির বিশ্বাস, মনীষিতার সাধনা শীগগির ওকে তারকার উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। মনীষিতার গান শুনলে মনে হয় না কোথাও পিছিয়ে রয়েছি আমরা! ওদের হাত ধরেই দিশেহারা বাংলাকে পথ দেখাবে ডুয়ার্স।

নিজস্ব প্রতিবেদন

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া

আবারো একটি পঁচিশে বৈশাখ। আবারও একটি দীর্ঘ মাস স্মরণে বরণে রবিকবি। যে মানুষটি বাঙালি সংস্কৃতি ও মেধা মনন চর্চার এক বৃহত ও গভীর পরিধি নির্মাণ এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা কি একবার নতুন করে তাঁকে নতুন আলোয় দেখব না ? কতটা আধুনিক ছিলেন মানুষটি তাঁর ভাবনায় ও দর্শনে আর আমরা তাঁকে ঠিক কতটা মেধায়, কতটা হৃদয়ে, কতটা যাপনে, কতটাই বা চিন্তনে গ্রহণ অথবা অনুসরণ করে উঠতে পারলাম এই বিশ্বায়িত ভুবনগ্রামে দাঁড়িয়ে ! যে মানুষটা চিন্তাভাবনায় একজন সমাজ–সংস্কারকের থেকে কিছুমাত্রে কম ছিলেন না, যে মানুষটি নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে অসামান্য সব প্রবন্ধ ও মতামত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন কত বছর আগে, তাঁকে আমরা, এই সময়ের মেয়েরা কীভাবে দেখি, জানি, বুঝি ? শুধু কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুনগুনানির মেদুরতায় ড্রয়িংরুমেই বেঁচে থাকবেন কবি ? এসব অজস্র প্রশ্ন উঠে আসতে থাকে যখন লেখার বিষয় হিসেবে ভাবতে বসি সর্বস্তরের মেয়েদের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রচেতনায় নারীর অবস্থান বিষয়ে।

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায়ই আসলে নেই যে আজও রবীন্দ্রনাথের চেতনা ও চিন্তা কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের কাছেই গভীর প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই শিক্ষিত সমাজের সংজ্ঞাটাই বা আসলে ঠিক কী? সেখানেও “দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে/ আপন জেনে আদর করি নে/ পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে/ বন্ধু বলে দু'হাত ধরি নে” করে রেখেছি কি আমরা তাঁকে? সিরিয়াস গল্প উপন্যাস পাঠের ধৈর্যই যেখানে চিরকাল কম, সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে তিনি মেয়েদের নিয়ে ঠিক কতটা কী বলেছেন তা কতজন শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে! রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতায় যে রবীন্দ্রনাথ আপামর জনগণ না হলেও বৃহত্তর বাঙালি মননকে স্পর্শ করে আছেন, সেখানেও তাঁকে আমরা তাঁর গুরুদেবত্ব-র আড়াল সরিয়ে প্রাণের ঠাকুর করে নিই কেউ, অথবা অভ্যেসবশত, সংস্কৃতিমনস্কতার আবরণে নিজেকে মুড়ে নিতে চর্চা করি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের। এটুকুও একজন কবির প্রাসঙ্গিকতার কাছে হয়ত অনেকখানিই! শতবর্ষ পার করে তাঁকে কেউ পাঠ করবে এ নিশ্চয়তা কবির নিজেরই ছিল না। তবু মনে হয় যদি তাঁর গভীরতর দর্শন ও চিন্তা আরেকটু আমরা প্রসারতায় মেলে দিতে পারতাম সমাজের সেই স্তরেও, যেখানে নিছক বিলাসিতা করে রবীন্দ্রচর্চার অবকাশ পাওয়া দুরূহ! একথা অস্বীকার করা যায় না, প্রায় গীতা উপনিষদের মতো করেই কয়েকটি প্রজন্ম কবির বাণী পাঠ, গ্রহণ ও প্রয়োগ করে চলেছে নিজের যে কোনও মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই। তাঁরা সকলেই কি অবহিত এই সমাজ, সংসার, বৃহত্তর পৃথিবীতে নারীর অবস্থান বা ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার? বোধহয় না। কবি বিশ্বাস করতেন স্রষ্টা পৃথিবীতে নারী'কে পাঠিয়েছেন এই জগতসংসারকে শুধু উপভোগ বা আবিষ্কারের জন্যই না, একে ভালবাসার জন্য। সে রূপকথার গল্পের সেই মেয়েটি নয় যে অপেক্ষা করবে সোনার-কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙানোর। বরং তার হাতেই আছে সেই যাদুকাঠি যা দিয়ে সে প্রতিনিয়ত সজাগ করে রাখে তার অন্তর্দৃষ্টিটিকে। এই দণ্ডটি ক্ষমতা বা সম্পদের নয়, এ নিরন্তর ভালবাসার। এই যে মেয়েদের ভালবাসার ক্ষমতার ওপর রবীন্দ্রনাথের এই অপরিসীম বিশ্বাস, এখান থেকেই তো উৎসারিত তাঁর অসংখ্য রচনা। নারী-পুরুষের সমানাধিকার কেন অর্জন করে নিতে হবে? কেনই বা তা স্বতঃসিদ্ধ হবে না? এই অভিমানে তাড়িত হতে হতে বারবার তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সোচ্চার কবিকে পাই এইসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

অতএব রবীন্দ্রনাথ মানে কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীত মাত্র নয়, একথা বোঝা ও বোঝানোর ভারও আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকেই নিতে হবে কিন্তু, যাঁরা আমরা পেশাগত বা নেশাগত কারণে তাঁকে জানার বা বোঝার চেষ্টা করতে চাই। তাঁর জীবনের আশ্চর্য বহুমুখীনতা অসম্ভব আশ্চর্য করে আমাদের। তিনি এদেশের প্রথম সক্রিয় পরিবেশবিদ। তিনি গ্রামের মানুষকে স্বয়ম্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নিজে সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকর হিসেবে বিশ্বের দরবারে এদেশের দ্বার খুলে দিতে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন নিজের হাতে। লোকসাহিত্য চর্চার আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। অথচ দুঃখের এই যে লোকজীবন আজও অনবহিত তাঁর ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে। আশার কথা এই যে তথ্যপিপাসু বর্তমান প্রজন্ম খুঁজে আনছে রবীন্দ্রজগতের নানান অনালোকিত দিক। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দ্বারা অভিনীত ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ তাঁদের মানসলোকের অনন্য উত্তরণ ঘটিয়েছে আর তা সম্ভব হয়েছে মেধাবী রবীন্দ্র-অনুভবীর মাধ্যমেই। ঠিক এই উদ্যোগটুকু যদি বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়! রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কবিতার আবৃত্তির কথাই শুধু নয়, পৌঁছে দিতে হবে তাঁর আধুনিক চিন্তা যা মেয়েদের মানসিক ও আন্তরিক শক্তি জোগাবে যে কোনও কঠোর

> **প্রায় গীতা উপনিষদের মত করেই কয়েকটি প্রজন্ম কবির বাণী পাঠ, গ্রহণ ও প্রয়োগ করে চলেছে নিজের যেকোনও মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই। তাঁরা সকলেই কি অবহিত এই সমাজ, সংসার, বৃহত্তর পৃথিবীতে নারীর অবস্থান বা ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ? বোধহয় না। রবীন্দ্রনাথ ‘নারী’ প্রবন্ধে চমৎকার বলেছিলেন যে মেয়েদের যদি পুরুষের পেশীশক্তির দাপট দমিয়ে রাখতেই থাকে, তবে প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই বৈষম্যের শিকার হওয়া প্রাণীটির প্রতি অধিক মমত্বশীল হয়ে তার উপযোগী হয়ে ওঠার নিয়মে একদিন নারীকেই ক্ষমতার কেন্দ্রে বেছে নেবে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এরকম হয়ে আসছে।**

পরিস্থিতিতেই।

খুব স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' বিষয়ক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন— 'আমাদের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র পরিবারের সেবা করিবার জন্যই বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে থাকে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবীতে যে সকল উপায় আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ...তাহারা কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের উপাদান সামগ্রী হয়ে ওঠে'। কবিতা বা গানে যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অধিকাংশ সময়ই নারীকে দেখেছেন সুন্দর ও কোমল রূপটি'তে, মোহময় ও আকর্ষক রূপে; ভেবেছেন স্নেহময়ী জননী, প্রীতিময়ী আত্মীয়া, প্রেমদাত্রী স্ত্রী, বা প্রেমিকা রূপে, সেখানে অনেক সময় তা পুরুষের চোখ দিয়েই—"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/ আপন অন্তর হতে"। 'সবলা'র মতো কবিতাও লিখেছেন বৈকি—"নারীকে আপন ভাগ্য করিবার জয়/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা"! কিন্তু কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও সৃষ্টিতেই নারীর প্রকৃত আধুনিক রূপটির হদিশ আমরা পাই। শুধুমাত্র শোভনা বা কল্যাণী রূপেই যে নারীজন্মের সার্থকতা আবদ্ধ নয়, তা তিনি গদ্য সাহিত্যেই আলোচনা করেছেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে যেমন স্বামীর 'চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল' জানিয়ে দেয় 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না"। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী পারিবারিক উদাসীনতা ও অপমানের শিকার হয়ে যে গৃহত্যাগ করতে পারে সগৌরবে, সেই সত্য রবীন্দ্রনাথ কী উজ্জ্বল এঁকে রাখলেন! নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছি আমরা অনেককাল, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যথার্থভাবেই।

'মুক্তি' কবিতায় তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলির মতো করে কে'ই বা নারীর অবস্থান এত স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—"আমি নারী, আমি মহীয়সী,/ আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।/ আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,/ মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা"। অথবা 'চিত্রাঙ্গদা'য় সেই অপূর্ব উক্তি—"পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,/ হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।/ যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে/ সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে/ পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে"। রবীন্দ্রনাথের সত্য ও সুন্দরের আরাধনা করা কবি-মানস কখনওই নারীকে কেবল লক্ষ্মীমেয়ের ভূমিকায় দেখতে চায়নি; "রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা"র জগতের বাইরে বৃহৎ বিশ্বলোকের মাঝখানে তার মুক্তি চেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করতেন তিনি। সেই ক্ষমতায়ন দম্ভের বা আস্ফালনের জন্য অর্জিত ক্ষমতা নয়। তা বিশ্বলোকের মূল সৃষ্টির সুরটিকে সঠিক তালে লয়ে স্পন্দিত হওয়ার জন্য নারীর প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ 'নারী' প্রবন্ধে চমৎকার বলেছিলেন যে মেয়েদের যদি পুরুষের পেশীশক্তির দাপট দমিয়ে রাখতেই থাকে, তবে প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই বৈষম্যের শিকার হওয়া প্রাণীটির প্রতি অধিক মমত্বশীল হয়ে তার উপযোগী হয়ে ওঠার নিয়মে একদিন নারীকেই ক্ষমতার কেন্দ্রে বেছে নেবে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এরকম হয়ে আসছে। এই যে দর্শন, এই যে চেতনা তা কিন্তু নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সময়ও আমরা বিস্মৃত হই।

ছোট গল্পগুলিতে যে স্বাধীন নারীর ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা এই সময়েও আধুনিকতম নিদর্শন হয়ে আছে। 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী স্কুলের শিক্ষিকা। আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ, সংযত, স্বাধীন মেয়েটি অনায়াসে উপেক্ষা করে মুগ্ধ পুরুষের প্রেম ও পরিণয় প্রস্তাব। 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার হৃদয়ের কেন্দ্রে কোনও পুরুষ নয়, সমগ্র হৃদয় জুড়ে সে নিজেই। 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা চরম আত্মসম্মান আহত হওয়ার পর অভিমানে স্থির থেকে স্বামীর অস্তিত্বই অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করেছিল। সদ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"একজন বুদ্ধি ও হৃদয়বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো এমনকি তার চেয়ে অধম, একটা জড় পদার্থের মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ করে তোলা... এসকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়"।

এসমস্ত লেখা ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা মানতে চাননি, অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা এবং পত্রিকায় বাদ দেওয়া হয়েছিল অংশটুকু। বোঝা যায়, তাঁর সময় থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজকের সময়ের থেকেও এগিয়েই আছেন তিনি। না'হলে কীভাবে লিখবেন এমন কথা—" স্ত্রীলোকেরা যে কেবল আমাদের বিশেষ কাজ করবেন এবং কেবলমাত্র তারই জন্যে উপযুক্ত হবেন তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাঁরা কেবল ভার্যা এবং গর্ভধারিণী নন, তারা মানবী, অতএব সাধারণ বুদ্ধি এবং সাধারণ জ্ঞান তাঁদের উন্নতির পক্ষেও আবশ্যক। কেবল তাই নয়— বলতে সাহস হয় না, গড়ের মাঠ যদি সাধারণের জন্য হয় তবে এই গড়ের মাঠের হাওয়ায় তাঁদেরও শরীরের স্বাস্থ্য এবং চিত্তের প্রফুল্লতা ও কমনীয়তা সাধন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তাঁরা আমাদের স্ত্রী ও জননী বলেই যে তাঁদের পৃথিবীর শোভা-স্বাস্থ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা অত্যাবশ্যক এ কথার কোনো অর্থ বোঝা যায় না"। অথচ এরপরও কিন্তু সমাজ সংস্কারক হিসেবে, নারী শিক্ষার পুরোধা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করি না।

রবীন্দ্রনাথ মানে কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীত মাত্র নয়, তিনি এদেশের প্রথম সক্রিয় পরিবেশবিদ। তিনি গ্রামের মানুষকে স্বয়ম্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নিজে সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকর হিসেবে বিশ্বের দরবারে এদেশের দ্বার খুলে দিতে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন নিজের হাতে। লোকসাহিত্য চর্চার আগ্রহ তৈরী হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। অথচ দুঃখের এই যে লোকজীবন আজও অনবহিত তাঁর ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে।

'দেনাপাওনা'র মতো পণপ্রথা বধূহত্যার গল্প'ই শুধু লেখেননি, গভীর নারী মনস্তত্ত্বের গল্পও অনেক লিখেছেন। 'ঘরে বাইরে', 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি'—এগুলি রচনায় তিনি সমকালে বহুল সমালোচিতও হয়েছিলেন। বিনোদিনীর ন্যায় অন্যায় বোধ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই কিন্তু একটি বিধবা তরুণীর অবদমনে শারীরিক অতৃপ্তি বা সুখী সংসারের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করা যায় না। আজও এই বিষয় নিয়ে সিনেমা বা উপন্যাস হলে তাকে আধুনিক মনন বলেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকি আমরা। কারণ সেটিই মনস্তত্ত্বের সঠিক বিশ্লেষণ। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অমিত'কে ভালবেসেও তার চরিত্রের লঘুতা ও জটিলতাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার স্পর্ধা করেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমু'র মতো মানসিক জোর কল্পনা করা যায় না এই সময়ের কোনও মূল নারী-চরিত্রেও! সন্তানসম্ভবা কুমু স্বামীর ঘর ত্যাগ করে দাদা'র কাছে ফিরে আসতে চায়। দাদা তার অনাগত সন্তানের জন্য তাকে ফিরে যেতে বলে। কারণ সন্তানের ওপর অধিকার তো কেবল পিতার! কিন্তু কুমু উচ্চারণ করে অসামান্য একটি বাক্য—"এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না"। সে সিদ্ধান্ত নেয় সন্তানকে তার নিজের ঘরে দিয়েই সে ফিরে আসবে বাপের বাড়ি। তার নিজের কোনও ঘর নেই— কোত্থাও না। আজো কি আছে কোথাও নারীর নিজের বাড়ি, নিজস্ব ঘর? কতজনের আছে? রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন সেই অনিকেত বেদনা।

আসলে রবীন্দ্রনাথের চেতনার বৈচিত্র্য এত বিভিন্ন যে তাঁর বহু রচনা বিস্মরণের আড়ালেও রয়ে যায়। তিনি আমাদের যতটা আবেগের যতটা হৃদয়ের, ততটা মস্তিষ্কের করে তুলতে পারি না অনেকেই। শুধুমাত্র রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণা করা মানুষজনের পরিধিতেই থেকে যান এই প্রবল মেধাবী ব্যক্তিত্ব। সাধারণের জন্য পড়ে থাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা মন্ত্রোচ্চারণের মতো অভ্যেসে বা ড্রয়িংরুমের সংস্কৃতিতে বাঁধা পড়ে থাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের শেষ পারানির কড়ি, চির আশ্রয়। তবু যারা শনি ঠাকুর পুজো না করে রবি ঠাকুরের পুজো করি তাঁদের জন্যই কেন কেবল মনস্বী কবি রইবেন, এ প্রশ্ন নিজেদের করার সময় অনেককাল এসেছে। শান্তিনিকেতনে যে বসন্তোৎসব, রাখি উৎসব বা পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপন তাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল, তা আমরা ক্রমশ সারা রাজ্য জুড়েই পালনের উদ্যোগ দেখছি। সেই সঙ্গে যদি এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুভব, দর্শন, মেধাবী রচনাগুলিও আমরা পালন করতে পারি— তবে এই বিপন্ন সময়ে ঠাকুরপুজোর অনুষঙ্গ থেকে হয়ত বেরিয়ে আসবেন তিনি। হাত রাখবেন আমাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে। মানুষের বিপন্নতা সামগ্রিকভাবে ক্রমবর্ধমান। তিনিই এক সম্পূর্ণ মানুষ যিনি যে কোনও মানুষের নারী ও পুরুষ উভয় সত্তাকেই গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণের ক্ষমতা রাখতেন। তাঁর পংক্তির হাত ধরেই আমরা না হয় চৌকাঠের এপার ওপার এক পংক্তিতে বসি আজ!

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

চেল পাড়ের চারুলতা

‘চেল নদীর পারে জঙ্গল আর চা বাগান ঘেরা ছোট্ট জনপদ মানাবাড়িতে বসে বাড়ির উঠোন থেকে দেখতে পেতাম চুইকিম পাথরঝোরা পাহাড়ে-মেঘে আলোর রং-বেরঙের পোশাক পরিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির ভালবাসা।’ সেই ছাত্রী জীবনে শুরু হয় স্বপ্ন দেখা, রঙের খেলাকে পোশাকে নিয়ে আসা। সুযোগ পেলেই ছুটে যাওয়া রাভা, মেচদের বস্তিতে। তাদের পোশাক কী করে আরও সুন্দর করা যায়, কী ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে সেই ভাবনার বাস্তব রূপ দিতেই চারুলতা বুটিক। আজকের ‘আমি চারুলতা’। কর্ণধার শিল্পী দে মুখার্জী অকপটে স্বীকার করেন প্রথম দিকে গ্রামীণ শিল্পীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

সালটা ২০০৫। চেল, লিশ, ঘিস ছেড়ে শিল্পী এলেন তিস্তাপারের জলপাইগুড়িতে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে। জীবন-সাথীর হাত ধরেই সুযোগ চলে আসে গ্রামে যারা কাজ করছে সেইসব মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার। বিশেষ করে কাঁথার কাজ। একাধিকবার বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে যেমন মূলভাগ্গা, মহিদাপুর ও বাহিরি গিয়ে কাঁথা শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করা, তাঁদের কাছে কাজ শেখা শুরু হয় শিল্পীর। তাঁদের জন্যেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় কি না সে নিয়েও চলে ভাবনা চিন্তা।

শিল্পী দে মুখার্জী

পুজোর আগে কলকাতার শ্রী গ্যালারিতে শিল্পী দে মুখার্জীর প্রথম শাড়ির প্রদর্শনী। ট্র্যাডিশনাল রাবীন্দ্রিক ও আধুনিকতা মিশিয়ে শিল্পীর শাড়ি সমাদৃত হয় শহর কলকাতায়। সবশেষে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ২০১২ তে জলপাইগুড়ির রায়কত পাড়ায় ছোট্ট একটি দোকান ঘরে শুরু হয় চারুলতার যাত্রা। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ছ'টা বছর পার করে সাতে পা দিয়েছে। ‘আমি চারুলতা’র পোশাক ডুয়ার্স ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তো যায়ই, এমনকি অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার ভারতীয় প্রবাসীদের হাত ধরে পৌঁছে যায় সেইসব দেশেও। ডুয়ার্স কন্যা শিল্পীর ‘আমি চারুলতা’ চেয়েছেন মানুষের কাছে নতুন কিছু পৌঁছে দিতে এবং সেইসাথে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর ট্র্যাডিশনাল, মধুবনী, হ্যান্ডলুম আর আধুনিকতাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে। যে লিনেন শাড়ি এখন ঘরে ঘরে তা প্রথম জলপাইগুড়িতে পা রেখেছিল চারুলতার হাত ধরেই। এখন যোগ হয়েছে গয়নাও। উদ্দেশ্য, সাজাব যতনে।

জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগারের পাশেই এখন ‘আমি চারুলতা’র ঠিকানা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের ডিশ

গ্রিন ড্রাই ফ্রাই

উপকরণ: ব্রোকলি মাঝারি সাইজের ১টি, ক্যাপসিকাম ২টি, বিনস ১০০ গ্রাম, আলু ২৫০ গ্রাম, মটর শুঁটি ২৫০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ১০-১২টি, চাট মশলা ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদ মতো, সাদা তেল ৫০ গ্রাম।

প্রণালী: সমস্ত সবজি আলাদা করে লম্বা করে কেটে রাখুন। প্রথমে আলু ভাজুন, তারপর বিনস পরে ব্রোকলি ভাজুন। এরপর তেলে প্রথমে ক্যাপসিকাম ও মটর শুঁটি দিন, ভালভাবে নারাচারা করে ভাজা সবজিগুলি দিয়ে দিন এবং কাচা লঙ্কা, চাট মশলা, গোলমরিচ ও লবণ দিয়ে ভাল করে অন্তত পাঁচ মিনিট ভাজা ভাজা করুন। গরম গরম লুচি, পরটা বা

খিচুরির সঙ্গে পরিবেশন করুন, অনবদ্য স্বাদ অনুভব করবেন যাদের আপনি পরিবেশন করবেন।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

শিশু কন্যা ধর্ষণ রুখতে ফৌজদারী আইনের সাম্প্রতিকতম সংশোধন

ভারতে শিশু কন্যাদের শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তুলতে একদিকে যেমন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচীর শুভ সূচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি শিশু কন্যা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের উপর্যুপরি খবর আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। ভারতের মাটিতে কন্যা সন্তানেরা সত্যিই কতখানি নিরাপদ? ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ নং ধারা ও শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪ ও ৬ নং ধারায় ১৯,৭৬৫টি শিশু ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে! যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে আরও প্রায় ১২ হাজার শিশু! ক্রমবর্ধমান শিশু ধর্ষণের ঘটনায়, বিশেষত কাঠুয়া-উন্নাও-সুরাটের নৃশংস শিশু কন্যা ধর্ষণ ও হত্যার পরে, জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে ২১ এপ্রিল ২০১৮ শিশু ধর্ষণ রোধ করতে ফৌজদারী আইন সংশোধনের অধ্যাদেশে ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। ২২ এপ্রিল ২০১৮ রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করায় অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হয়।

সংশোধিত ফৌজদারী আইন কী বলে?

ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনতে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, ভারতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন, ১৮৭২ এবং শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (POCSO) নিম্নরূপ সংস্কার করা হয়েছে—

* নারী (১৬ বছরের উর্ধ্বে) ধর্ষণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শাস্তি ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড করা হয়েছে, সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাবাস।
* ১৬ বছরের কমবয়সি মেয়েদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাজা ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড করা হয়েছে, সর্বোচ্চ শাস্তি আমৃত্যু কারাবাস। ১৬ বছরের কমবয়সি মেয়েদের গণধর্ষণের ক্ষেত্রে একমাত্র শাস্তি আমৃত্যু কারাবাস।
* ১২ বছরের কমবয়সি মেয়েকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে কঠরতম শাস্তি প্রদান করা হয়েছে— ন্যূনতম সাজা ২০ বছরের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি আমৃত্যু কারাবাস অথবা মৃত্যুদণ্ড। ১২ বছরের কমবয়সি মেয়েকে গণধর্ষণ করলে আমৃত্যু কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডের সাজা ধার্য্য করা হয়েছে।

দ্রুত তদন্ত এবং বিচার

* ধর্ষণ মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে দু'মাসের মধ্যে।
* শুনানি শেষ করতে হবে দু'মাসের মধ্যে।
* আপিল মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে ছ'মাসের মধ্যে।

জামিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা

* ১৬ বছরের নীচের মেয়েকে ধর্ষণের বা গণধর্ষণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা কখনই আগাম জামিন পাবেন না।
* ১৬ বছরের নীচের মেয়েকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার আগে সরকারি আইনজীবী এবং নির্যাতিতার প্রতিনিধিকে (আইনজীবী) অন্তত ১৫ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে।

অন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি?

ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া এবং ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আদালত ও অভিযোক্তা পক্ষের সশক্তিকরণ

* ধর্ষণের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দেশের সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও উচ্চ আদালতের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আরও ফার্স্ট ট্র্যাক আদালত গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
* সরকারি আইনজীবীর অনেক নতুন পদ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করা হবে।
* সব থানা ও হাসপাতালে ধর্ষণ শনাক্তকরণের জন্য বিশেষ ফরেনসিক কিট রাখতে হবে।
* সময়ের সীমাবদ্ধতা মেনে কেবলমাত্র ধর্ষণের অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য বিশেষ দল গঠন করা হবে।
* ধর্ষণের তদন্তের স্বার্থে প্রতিটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হবে।

জাতীয় তথ্যভাণ্ডার

যৌন অপরাধ ও অপরাধীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো তৈরি করবে একটি জাতীয় তথ্যভাণ্ডার। প্রয়োজন অনুযায়ী সে সব তথ্য সরবরাহ করা হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুলিশ বিভাগকে।

নির্যাতিতাকে সহযোগিতা

নির্যাতিতার হয়রানি রুখতে, আর্থিক ও আইনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই চালু থাকা 'ওয়ান-স্টপ সেন্টার' প্রকল্পকে জেলাস্তরে সম্প্রসারিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১২ সালে রাজধানী দিল্লিতে সংঘটিত 'নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ড' সারা বিশ্বের বিবেকবোধকে আন্দোলিত করেছিল। সেই বর্বরোচিত ধর্ষণের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমেছিলেন ভারত তথা গোটা বিশ্ববাসী। সেবারেও অধ্যাদেশ জারি করে ফৌজদারি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয় এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনে প্রভূত পরিবর্তন আনা হয়। তবুও সারা ভারতের প্রতিটি কোণায় ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন ঘটে চলেছে নিরন্তর। দুঃখের বিষয়, নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের অপরাধীদের সর্বোচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেও, আজও তা কার্যকর হয়নি! আমরা তাকিয়ে আছি সেই সুদিনের দিকে যেদিন বয়স-ধর্ম-জাতপাত-আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ধর্ষিতা প্রকৃত ন্যায় বিচার পাবেন, প্রতিটি ধর্ষকের ওপর নেমে আসবে দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তি।

রাখি পুরকায়স্থ

আইন বিশেষজ্ঞ Email: rakhe.pur@gmail.com

মেয়েবেলার ডুয়ার্স

জ্যোৎস্না রাতের লম্বা ভূত যে হাতছানি দিয়ে ডাকে !

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম প্রেমেরডাঙা। এই গ্রামের ধার ঘেঁষে তাঁতের শাড়ির পাড়ের মতো পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তোর্সার উপনদী ভেরভেরী। শীর্ণকায় এই তন্বী তরুণী নদীটিই বর্ষাকালে হয়ে উঠত দুর্দান্ত, দু' কুল ছাপিয়ে ছুটত, দেখা দিত 'অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণিমাতন'। এই ভেরভেরীর তীরে প্রেমেরডাঙা গ্রামেই কেটেছে আমার শৈশব কৈশোর। বড় শরিকি বাড়ি, বিরাট উঠোন। সাত ভাইয়ের সবার ছোট ভাই আমার বাবা। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি সূত্রে তিনি থাকতেন বাইরে। জ্যেঠা জ্যেঠি এবং সমস্ত ভাইবোন মিলে বাড়িতে তখন অনেক লোক। বড় জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার বাবার বয়সের তফাৎটা ছিল পিতা-পুত্রের মতো। আবার বড় জ্যেঠামশাইয়ের বড় ছেলে অর্থাৎ বড়দার সঙ্গে আমাদের বয়সের তফাৎটাও ছিল ওইরকম। আমার মা, ছোট জ্যেঠিমা, ধন জ্যেঠিমা বড়দাকে ভাসুরপো বলে ডাকলেও ঘোমটার আড়াল থেকেই কথা বলতেন; কারণ বড়দা তাঁদের চাইতে বয়সে বড় ছিল এবং বড় জ্যেঠিমার এটাই নির্দেশ ছিল। অন্যান্য জ্যেঠিমা ও মার কাছে তিনি ছিলেন শাশুড়ির মতো, তাঁর সব নির্দেশ মেনে চলতে হত। ঠাকুমা বেঁচে থাকলেও বয়সের ভারে তিনি তখন ন্যুব্জ; তুলসীতলা, সন্ধ্যা-আহ্নিক নিয়ে আপনমনে তাঁর সময় কাটত। প্রকৃতিগতভাবেও তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ।

সময়টা সত্তরের দশকের শেষ, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী, গাছে ওঠা থেকে সাঁতার কাটা সব বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিই। আমার এই দূরন্তপনা বড় জ্যেঠিমার মোটেই পছন্দ ছিল না। আমার জন্য বড় জ্যেঠিমার কাছে মাকে প্রায়ই কথা শুনতে হত আর মা রেগে গেলেই আমায় বেদম মারতেন। আমি তখন মন খারাপ করে গাছের মগডালে উঠে বসে থাকতাম। আমাদের বাড়ির চারধারে আম, জাম, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা, সুপারি ইত্যাদি সব গাছ ছিল; সেই সঙ্গে ছিল অসংখ্য বাঁশের ঝাড় আর কলাগাছের ঝোপ। আমি পাতার আড়ালে এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকতাম কেউ খুঁজে পেত না। তবে ধন জ্যেঠিমার মেয়ে দীপাদি ছিল চালাক, আমার গতিবিধি তার জানা ছিল। সে আমাকে ঠিক খুঁজে বের করত। গাছে উঠতে পারত না বলে লম্বা বাঁশের কোটা নিয়ে আমায় খোঁচা দেবার ভয় দেখিয়ে নামাবার চেষ্টা করত আর চিৎকার করে মাকে ডাকত— 'খুড়িমা... এই যে পাইছি; দেখুইন আইয়া কই পালাইয়া রইজে সঞ্চ'। দীপাদির ওপর আমার খুব রাগ ছিল, প্রায় সময়ই নিজে দোষ করে আমার নামে চাপিয়ে দিত। আমি দূরন্ত ছিলাম বলে মা দীপাদিকেই বিশ্বাস করত বেশি। আমার নামে মায়ের কাছে নালিশ করতে ও মজা পেত। মা আমায় মারলে আড়ালে চুপি চুপি এসে বলত— 'কী রে! কীরম খাইলি!'

আমি আর দীপাদি রোজ রাতে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতাম। শুনতাম ঠাকুমার ছোটবেলার কাহিনি, বাংলাদেশের কথা, পদ্মা নদীর কথা, বাবা জ্যেঠামশাইদের বেড়ে ওঠার গল্প, ঠাকুর্দার কথা ইত্যাদি। আমার বাবা যখন সাত বছরের শিশু তখন আমার ঠাকুর্দা মারা গিয়েছেন তাই ঠাকুর্দার চেহারা কেমন ছিল জানি না। তবে ঠাকুমার কাছে তাঁর গল্প শুনে শুনে একটা ছবি মনের ভেতর আঁকা হয়েছিল। গল্প শুনে শুনে বাংলাদেশকে মনে হত লাল নীল রূপকথার জগৎ। ঠাকুমার সব গল্প আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। মাঝে মধ্যে দীপাদি বায়না করে বলত— 'আইজ একটা ভূতের কিচ্ছা কও হামা (ঠামা)'। গ্রামের রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমন নিস্তব্ধ রাতে ভূতের গল্প শোনা সে এক গা ছমছম করা শিহরণ। ঠাকুমা বলতেন— 'দেশের বাড়ির কত ভূত দেখছি; মুহো (মুখে) বাতি লইয়া, বাড়ির চাইর দিগে কন্দ পাতারে ঘুইর্‌য়া বেড়াইতাছে। এরার ঠাহুর্দা তো কতবার ভূতের লগে পাছরাপাছরি করছে। একবার তো মাইজরাইতে মাঝ ধরবার যাইয়া একটা বড় মাছ ধরছে; হেই মাছ একদিগে ভূতে টানে আরেক দিগে তরার ঠাকুর্দায় টানে।' তখন এই গল্পগুলো ভীষণ সত্যি বলে মনে হত। মনে আছে ভূতের ভয়ে তখন এঘর থেকে ওঘরে দৌড়ে যেতাম; কেবলই মনে হত ভূতেরা নিশ্চয়ই মুখে বাতি নিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুমা মারা গেলেন কিন্তু তাঁর সেই ভূতের গল্পগুলো এখনও আমাদের মনে বেঁচে আছে। ঠাকুমা যখন মারা গেলেন তখন জন্ম-মৃত্যুর এই কঠোর বাস্তবতা সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না তাই ঠাকুমা মারা যাবার সময় যে কষ্ট পেয়েছি এই পরিণত বয়সে সেই কষ্ট অনেক বেশি করে অনুভূত হয়।

একবার আমার দাদু কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। আমরা দাদুকেও চেপে ধরলাম ভূতের গল্প শুনব; দাদু ধমকে উঠলেন ভূত বলে কিছু নেই। দাদুর সঙ্গে একদিন রাতে প্রেমেরডাঙা হাট থেকে বাড়ি ফিরছি। হাটটি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত, তবু দূরে দূরে গাছগুলোকে ভূতের মতোই দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে সারা রাস্তা এদিক ওদিক তাকিয়েছি যদি ভূত দেখে ফেলি। সারা রাস্তা ভূতের দেখা না পেলেও বাড়ির কাছে বাইর বাড়িতে এসে দেখি বাড়ির সদর দরজায় সাদা কাপড় পরা বিরাট লম্বা সত্যি এক ভূত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো 'দাদু গো ভূত' বলে এক চিৎকার দিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরলাম। দাদু প্রথমটা 'কোথায় ভূত' বলে ধমকে উঠলেন কিন্তু আমার বিকট চিৎকারে আর সামনে সত্যিই সাদা ধবধবে লম্বা আকৃতির একটা ভূত দেখে দাদুও হতভম্ব। আমার অনবরত চিৎকারে ভূত হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি তখনও দাদুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে চলেছি।

এটা ছিল দীপাদির বুদ্ধি। দাদুর ভূতে বিশ্বাস ছিল না বলে বড় বৌদির সঙ্গে যুক্তি করে দাদুকে ভূতের ভয় দেখাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু আমার চিৎকারে সব ভেস্তে গেল। দীপাদি বৌদির হাতে একটা ঘটি উল্টো করে ধরিয়ে হাতদুটো কাঁধ বরাবর সোজা উপরে তুলে দিয়ে দুটো ধুতি ক্রমাগত সারা শরীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরের হাতদুটোও পেঁচিয়ে দু'হাতের ওপর রাখা ঘটিটিকে ঘোমটা পরিয়ে দিয়েছিল। বড় বৌদি এমনিতেই ছিপছিপে লম্বা ওইরকম করে সাজানোতে বিরাট লম্বা লাগছিল। দু'হাতের ওপর উল্টো করে রাখা ঘটটি মনে হচ্ছিল ঘোমটা পরা ভূতের মুণ্ডু! জ্যোৎস্না রাতে সেই ভয়ংকর ভূতের আকৃতির কথা এখনও মনে আছে।

মেজদা, সেজদা তখনও কারও বিয়ে হয়নি, বড় বৌদিই ছিল বাড়ির একমাত্র বৌদি। বড়দার বৌ বলেই বড় বৌদি বলে ডাকবার হুকুম হয়েছিল। বড় বৌদি ছিল পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বৌ। গায়ের রং ছিল দুধে আলতা। মনে আছে বড় বৌদি তখন প্রায়ই কচি কলাপাতা রংয়ের একটা শাড়ি পরত, দেখে মনে হত আসমান থেকে কোনও পরী নেমে এসেছে। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি তখন পাড়ার মেয়ে কুসুমদির বিয়ে হল। বিয়ের গিঁট খুলতে এসেই কুসুমদির বরের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সকলের আলাপ হল। বেশ মিশুকে, প্রথম আলাপেই আমাদের বাড়ির সবাইকে আপন করে নিয়েছিল। কুসুমদির বরের সঙ্গে বড় বৌদি এবং দীপাদির ঠাট্টার সম্পর্কটা ক্রমে জমে উঠল। কুসুমদির বর মাঝে মাঝে একা একাই শ্বশুড়বাড়ি চলে আসত। সবাই বলত জামাইয়ের শ্বশুড়বাড়ির ওপর টান আছে। এলে প্রায়ই সপ্তাহখানেক থেকে যেত। প্রতিদিনই আমরা নদীতে স্নান করতে যেতাম। নদী ছিল আমাদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রস্থল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার, পুড়ি সাঁতার, মরা সাঁতার, চিল সাঁতার কত

একদিন জামাইবাবুর প্রস্তাবে বড় বৌদি ও জামাইবাবু কে কতক্ষণ জলে ডুব দিয়ে থাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা হল। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম জামাইবাবু ডুব দিয়েই বড় বৌদির কাছে চলে গিয়েছিল। জলের তলায় বেশ তোলপাড় হচ্ছিল। বড় বৌদি যখন ভেসে উঠল তখন তার চোখ লাল, জল খেয়ে কাশতে শুরু করেছিল।

রকমের সাঁতারের প্রতিযোগিতা হত। যখন জল থেকে উঠে আসতাম বিবর্ণ হত গায়ের রং, চোখ দুটো হত রক্তজবা তবু এসবে বেশ আনন্দ ছিল। কুসুমদির বর এসে যোগ দেওয়াতে সাঁতারের আনন্দ অন্য মাত্রা পেল। বৌদি, দীপাদি, আমি, অহল্যা আমরা সবাই একপক্ষ, জামাইবাবু একাই অন্যপক্ষ। আমরা ডুব সাঁতার দিয়ে উধাও হয়ে যেতাম জামাইবাবুও ডুব সাঁতার দিয়ে আমাদের ছুঁয়ে ফেলত। একটা বিষয় লক্ষ্য করতাম আমি সাঁতারে অনেক বেশি পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও জামাইবাবু কেন জানি না বড় বৌদি এবং দীপাদির পেছনেই ধাওয়া করত। আমার খুব অভিমান হত। একদিন জামাইবাবুর প্রস্তাবে বড় বৌদি ও জামাইবাবু কে কতক্ষণ জলে ডুব দিয়ে থাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা হল। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম জামাইবাবু ডুব দিয়েই বড় বৌদির কাছে চলে গিয়েছিল। জলের তলায় বেশ তোলপাড় হচ্ছিল। বড় বৌদি যখন ভেসে উঠল তখন তার চোখ লাল, জল খেয়ে কাশতে শুরু করেছিল। এটুকু বুঝেছিলাম জামাইবাবু জোর করে বৌদিকে জলের তলায় টেনে রেখেছিল।

পরদিন দীপাদি আমায় ইশারা করে ডেকে চুপি চুপি ছোট জেঠিমার ঘরের পিছনে নিয়ে গেল। ঘরের পেছনে ছিল লাউ জঙ্গল তার নীচে হলুদ খেত সেখানে জোঁকের আড্ডা। জোঁককে আমার ভীষণ ভয় তবু দীপাদি টানতে টানতে নিয়ে গেল সেখানে। ঘরের ভেতর ফিস ফিস কথা আর কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাঁশের বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুজনে চোখ লাগিয়ে দেখলাম, বড় বৌদি কাঁদছে। বৌদির খোলা পিঠে মা এবং ছোট জেঠিমা বোরোলীন ডলে দিচ্ছিলেন। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো ঘরে প্রবেশ করেছিল তাতে বৌদির ধবধবে ফর্সা পিঠটায় চাবুকের মতো লম্বা লম্বা দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ছোট জেঠিমা বললেন, 'ভাসুরপুড়া মানুষ না এইবায় মারে!' দীপাদি কানে কানে বলল— কুসুমের জামাইয়ের লইগ্যা বড় বৌদি মাইর খাইলো'! আমি সেদিন কিছু বুঝতে পারিনি। এখন এই পরিণত বয়সে সব পরিষ্কার বুঝতে পারি। দীপাদি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিল বলে সব বুঝতো। দীপাদি আরও বলেছিল— 'কুসুমদির জামাইডা ভালা না, আমারেও একদিন জলের তলে ঠাইস্যা ধইর‍্যা রাখছিল'। এখন বুঝতে পারি আমি সাঁতারে পটু হওয়া সত্ত্বেও কেন জামাইবাবু আমার পেছনে ধাওয়া করত না। জানি না সেদিন জলের তলায় বৌদির সঙ্গে সে ঠিক কী আচরণ করেছিল! বড়দা এসব কথা জানতে পেরেই বৌদিকে বেদম পিটিয়েছিল। বাড়ির বড়দের কানে এসব কথা উঠেছিল। সেই থেকে কুসুমদির বরের আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ হয়েছিল।

আমাদের পাশের বাড়িটি ছিল 'ঝালো বাড়ি'। অনেকগুলো জেলে পরিবার এক বাড়িতে বাস করত। মাছ ধরা নৌকা চালান ছিল তাদের পেশা। সেই বাড়ির মেয়ে অহল্যা ছিল আমার ভীষণ বন্ধু। গ্রামে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না বলে অহল্যা আমার চেয়ে দু' বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও পড়ত দু' ক্লাস নীচে। এক ক্লাসে না পড়লেও অহল্যা ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সাঁতার, ছি-বুড়ি, গোল্লাছুট, পাকা সড়কে বসে পাথর দিয়ে 'একটি পয়সা তেলের দাম/ মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি খেলা; এক কথায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদের একসঙ্গে কাটত। আমরা কায়স্থ ছিলাম বলে অহল্যাদের বাড়িতে আমাদের জলস্পর্শ করাও মানা ছিল কারণ জাত চলে যাবে। জাত কী, কেমন করে যাবে এসব না বুঝলেও বড় জেঠিমার নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হত। অহল্যার সঙ্গে মেলামেশা করতে মা বারণ করতেন। বারণ শুনতাম না বলে মায়ের কাছে অনেক মার খেয়েছি, কান ধরে ওঠবোস করেছি, আর কখনও মিশবো না বলেছি। পরক্ষণেই আবার চুপি চুপি নদীর তীরে কুলগাছ তলায় ঝোপের আড়ালে দেখা করেছি, গল্প করেছি। অহল্যা বাড়ি থেকে পাকা কলা এনে দিয়ে বলত— 'গাছের সব্রিকলা, খা। গাছের ফল খাইলে দোষ নাই, জাত যায় না।' অহল্যা আমাকে যা এনে দিত সব খেতাম। তবে বাড়িতে কাউকে বলিনি। হঠাৎই একদিন অহল্যা বলল— 'বলরামপুর থেইকা জামাইবাবু চিঠি আইছে কাইলকাই এইহান থনে জামুগা...... মা কইল।' একটু থেমে বলল— 'আমার বিয়া ঠিক অইছে'। বলতে বলতে দু'চোখে তার জল গড়িয়ে পড়ছে— 'সঞ্চ, বিয়া আমার ভালা লাগে না, তর মতো লেহাপড়া করুনের মন চায়! অহল্যার বয়স তখন বারো, ওই বয়সেই ওর বিয়ে হবে। দু'জনে গলা ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম । বুঝলাম ওকে একেবারেই এখান থেকে চলে যেতে হবে কারণ ওর বাবা মা-ও আর এখানে ফিরবে না; অহল্যার সঙ্গে ওর বরের বাড়ি থেকে যাবে। ওই গ্রামে তখন জেলেদের নিয়মানুযায়ী বরকে পণ দিতে হত। সেই পণ হিসাবে অহল্যার বাবা মাকে তার বর সারা জীবন ভরণপোষণ দেবে।

পরদিন পেট ব্যথার নাম করে স্কুলে গেলাম না। অহল্যা চলে যাবে এই কষ্ট সেদিন ভীষণভাবে পেয়ে বসেছিল। অহল্যারা সবার কাছে বিদায় নিয়ে বিকেলবেলা বলরামপুরের উদ্দেশে রওনা হল। তখন প্রেমেরডাঙা থেকে কোচবিহারে একটিমাত্র স্টেটবাস ভোরবেলা যেত ফলে পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খুট্টিমারী হয়ে তোর্সা পেরিয়ে রাজারহাট দিয়ে পায়ে হেঁটে কোচবিহার যাওয়া হত। আমিও অহল্যার সঙ্গে হেঁটে চলতে লাগলাম। কিছুতেই ওকে ছাড়তে মন চাইছিল না। যেতে যেতে অনেক দূর চলে গেলাম। অহল্যার মা বলল— 'সঞ্চ, ইবার তুমি বাড়িতে যাওগা, অনেক দূরে আইয়া পড়ছো। তুমার মাখে চিন্তা করব। তুমরার লইগ্যা আমবারও পরাণ পুড়বো। তুমরার মনের মিল থাকলে আবার অহল্যার লগে তুমার দেহা অইব।' অহল্যার মা বাবা আর বেঁচে নেই। সেই 'ঝালো বাড়িটি'ও আজ আর নেই। জীবিকার তাগিদে সব পরিবার কোথায় চলে গেছে; অহল্যার ঠিকানা আমায় কেউ দিতে পারেনি। সেদিন অহল্যার মায়ের কথায় থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। সম্বিত ফিরল, বাড়ি ফিরতে হবে। তখন সূর্য লাল হয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। তবু দাঁড়িয়ে থাকলাম যতক্ষণ অহল্যাকে দেখা গেল। অহল্যাও বারবার পেছন ফিরে আমায় দেখছিল। যখন অহল্যা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল আমিও উল্টো দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। মনে আছে বাড়ি ফিরতে সন্ধে পার হয়ে গিয়েছিল, মা প্রচণ্ড রেগেছিলেন। সেদিন আমায় মারতে মারতে মায়ের হাতের শাঁখা ভেঙে গিয়েছিল। তবুও মাকে বলিনি আমি অহল্যার সঙ্গে গিয়েছিলাম; মা আমায় অহল্যার সঙ্গে না মেশার দিব্যি দিয়েছিলেন যে। সেদিন সারারাত ঘুমোইনি, চুপি চুপি কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছিলাম। জানি না অহল্যাও আমার জন্য কেঁদেছিল কি না!

কিছুদিনের মধ্যে দীপাদির বিয়ে হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি জেলার শামুকতলায় বাবা পোস্টিং পেলেন। আমরাও চলে এলাম। প্রেমেরডাঙা স্কুল থেকে টি.সি. নিয়ে এসে ভরতি হলাম মহাকালগুড়ি মিশন স্কুলে। শুরু হল জীবনের আরেকটি অধ্যায়। মনে পড়ে প্রেমেরডাঙা স্কুলের মিনতি তালুকদার দিদিমণির কথা যাঁর মুখে তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি। মনে পড়ে অসিত চক্রবর্তী, জনার্দন চক্রবর্তী, হরেন ঘোষ, কেশব চক্রবর্তী সব স্যারদের কথা যাঁদের প্রশ্রয়ে শাসনে বেড়ে উঠেছি। এরপর মহাকালগুড়ি মিশন স্কুলের লীলা (সেনগুপ্ত) দিদিমণির কথা ভীষণ মনে পড়ে এমন বাংলা পড়ানো আর শুনিনি। যারা তাঁর ক্লাস পেয়েছে একমাত্র তারাই জানে। ভীষণ মনে পড়ে জ্যোতি (রাউত) দিদিমণি নীলিমা (নন্দী) দিদিমণি যাঁরা আমার বাংলা রচনা লেখা, আমার কবিতা আবৃত্তি, কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছেন। জীবনে যা পেয়েছি, যতটুকু হয়েছি তার জন্য এঁদের প্রত্যেকের কাছে আছে ঋণী।

ড. সঞ্চিতা দাশ

সারা রাস্তা ভূতের দেখা না পেলেও বাড়ির কাছে বাইর বাড়িতে এসে দেখি বাড়ির সদর দরজায় সাদা কাপড় পরা বিরাট লম্বা সত্যি এক ভূত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো 'দাদু গো ভূত' বলে এক চিৎকার দিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরলাম। দাদু প্রথমটা 'কোথায় ভূত' বলে ধমকে উঠলেন কিন্তু আমার বিকট চিৎকারে আর সামনে সত্যিই সাদা ধবধবে লম্বা আকৃতির একটা ভূত দেখে দাদুও হতভম্ব।

পুরাণ অফুরান

উলূপী এক উল্কা কন্যা

সর্বস্ব নিয়োজিত প্রেম কখনও কোনও নারী চরিত্রের ফোকাল পয়েন্ট হয়ে ওঠে। প্রেমের মধ্যেই সে পূর্ণতা পাওয়ার চেষ্টায় প্রয়াসী হয়ে ওঠে। মহাভারতের উলূপীও অনেকটা সেই বৃত্তের মধ্যে পড়ে। নাগকন্যা উলূপীর অর্জুন-প্রেম ছিল নিখাদ, চিরকালীন, স্বার্থহীন। এক তেজময়ী আত্মনির্ভর ভারতীয় নারীর মূর্ত প্রতীক উলূপীর প্রেমকথা অতি সংক্ষেপে হলেও নতুন প্রজন্মের জানা আবশ্যক।

দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর মহামুনি নারদের পরামর্শ অনুসারে নিয়ম স্থির হয়, দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের এক একজনের গৃহে একটি বৎসর করে বাস করবেন। কিন্তু এসময় অন্য কোনও পাণ্ডবভ্রাতা যদি এসে দেখা করেন তবে তাকে ব্রহ্মচারী হয়ে দ্বাদশ বৎসর বনবাসীর জীবন অতিবাহিত করতে হবে। অথচ নিয়ম বন্ধনের অল্পকাল পরেই দৈবের পরিহাসে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। লঙ্ঘন করেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। পরিস্থিতির সাপেক্ষে নিয়ম লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন ফাল্গুনী। দস্যুদের বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের গোধন রক্ষার্থে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে বাধ্য হন অর্জুন। অথচ সেসময় আয়ুধাগারে বাস করছিলেন দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির। দস্যুবিনাশ ও ব্রাহ্মণদের গোসম্পদ পুনরুদ্ধার করবার পর তাই নিয়মানুসারে দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসনে গেলেন পার্থ। পুরবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সঙ্গী হলেন ফাল্গুনীর এই অনির্দেশ্য বনবাসযাত্রার।

বহু তীর্থ, বহু প্রদেশ অতিক্রম করে অর্জুন উপস্থিত হলেন গঙ্গাদ্বারে। যা আজ হরিদ্বার নামে সুপ্রসিদ্ধ। গঙ্গা ভাগীরথীর অসামান্য প্রাকৃতিক শোভা দেখে পুলকিত হয়ে উঠলেন ফাল্গুনী। তিনি এতটাই প্রভাবিত হলেন গঙ্গাদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যে, সেখানে কিছুদিন বাস করবার জন্য নির্মাণ করে ফেললেন একটি আশ্রম। মন্ত্রোচ্চারণ করে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ শুরু করলেন আশ্রমে। জ্বলে উঠল যজ্ঞের আগুন। হয়ে চলল হোম আর পুষ্পাহুতি। পবিত্র যজ্ঞের অগ্নি আলোকে দৃষ্টিগোচর হল গঙ্গার অপর তটভূমি থেকেও।

কোনও এক পূণ্যপ্রভাতে স্নানের সময় ধনঞ্জয় নামলেন গঙ্গায়। স্নিগ্ধ, সুস্নাত হলেন গঙ্গার শীতল জলে। সমাপন করলেন পিতৃলোকের তর্পন। তর্পন সমাপনের পর অর্জুন প্রয়াসী হলেন জল থেকে উঠবার; আশ্রমে বসে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করবার উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময়েই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। নাগকন্যা উলূপী এস অর্জুনকে নিয়ে চলে গেলেন জলের গভীরে অন্য কোনও এক স্থানে। যেন অনেকটা মৎস্যকন্যা বা জলপরীর মতো। অর্জুনকে নিয়ে উলূপী উপস্থিত হলেন নাগরাজ কৌরব্যের রাজগৃহে। অর্জুন এসে দেখলেন সেখানে হোমকার্য্য সমাধার জন্য প্রজ্জ্বলিত রয়েছে অগ্নি। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে সেই পবিত্র অগ্নির সামনে হোমকার্য্য সমাপন করলেন অর্জুন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। উলূপী সহসা অর্জুনকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন কোনও নাগলোকে আর অর্জুনও কোনও বাধা দেওয়ার প্রয়াস করলেন না। অর্থাৎ উলূপী যেমন প্রথম দর্শনেই মোহিত হয়েছিলেন অর্জুনকে দেখে; ঠিক একইভাবে অর্জুনেরও কোনওরকম আপত্তি ছিল না উলূপীর সঙ্গলাভে। নাগসুন্দরীর আকর্ষণে তিনিও চললেন জঙ্গলের গভীরে এক সংবেশিত আচ্ছন্নতায়।

অগ্নিহোত্র কার্য্য সমাধা হওয়ার পর অনেকটা যেন স্থিতধী হলেন ফাল্গুনী। বাস্তববোধে অনুধাবন করলেন এই সুন্দরী কন্যা নিশ্চয়ই তাঁকে অগ্নিহোত্র কার্য্য সুসমাধানের জন্য এখানে নিয়ে আসেনি। হয়ত বা সম্যকভাবে বুঝতেও পেরেছিলেন তাঁর প্রতি উলূপীর এই দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই স্মিতহাস্যে উলূপীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সহসা এমন অসম সাহসের একটা কাজ করলে কেন সুন্দরী? এই সুন্দর দেশটিই বা কার? আর তুমিই বা কে? কী তোমার বংশপরিচয়? একসাথে বেশকিছু প্রশ্নের অবতারণা করলেন ফাল্গুনী। উলূপী উত্তর দিলেন, আমি নাগকন্যা। প্রসিদ্ধ ঐরাবৎ বংশে জন্মেছেন আমার পিতা কৌরব্য। তাঁরই দুহিতা আমি উলূপী। খুব স্পষ্টভাবে অর্জুনকে নিজের ও নিজের বংশপরিচয় জানালেন উলূপী। আরও বললেন, তুমি যখন গঙ্গাস্নান করছিলে, তখনই তোমাকে দেখে সম্মোহিত হয়েছি আমি, সম্পূর্ণ প্রণয়াসক্ত হয়েছি তোমার প্রতি। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার দেহ ও মন দুই-ই ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

উলূপীর কথাবার্তা এটা ভীষণভাবে স্পষ্ট যে, অর্জুনের কাছে সর্বস্ব নিবেদনের জন্য এই নাগকন্যার সমগ্র সত্তা তীব্ররকম উৎসুক। উলূপী অর্জুনকে বলেছেন, আমার তো স্বামীও নেই, যিনি আমার সত্তার অধিকারী, অতএব আমাকে তুমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ কর। প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতে আরও কথিত আছে এই নাগকন্যার পূর্বেই একবার বিবাহ হয়েছিল এক নাগ সম্প্রদায়ের পুরুষের সঙ্গে। সুন্দরী কন্যা নিজ সম্প্রদায়ের যোগ্য পাত্রের হাতে সমর্পণ করেন উলূপীর পিতা ঐরাবত কৌরব্য। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে উলূপীর স্বামী নিহত হন পক্ষীরাজ গরুড়ের হাতে। পিতৃগৃহেই পালিত হতে থাকলেন উলূপী। জীবনে নেমে এল অমাবস্যার নিকষ অন্ধকার। কোনও সন্তানও না থাকবার কারণে এই নিরস জীবন অতিবাহিত করবার মতো কোনও অবলম্বনও ছিল না তাঁর।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, যন্ত্রণা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়ে আসে। উলূপীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ধীরে ধীরে তিনিও ভুললেন স্বামীর কথা। অথচ উলূপীর তো বয়স বেশি নয়। তাই অন্তরের গভীরে কামনার বহ্নি প্রশমিত হয়নি তখনও। সচেতন হোক আর অবচেতন হোক তিনি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করছিলেন এমন এক পুরুষের যার সঙ্গলাভ তিনি তৃপ্ত হতে পারেন। তাই যখন তিনি দেখতে পেয়েছেন গঙ্গাস্নানরত ফাল্গুনীকে— মোহিত হয়ে পড়েছেন তাঁকে দেখে। নিঃসঙ্কোচে আত্মনিবেদন করতে চেয়েছেন অর্জুনের কাছে।

উলূপীর এই তন্ময়ীভবন, অর্জুনকে পাবার ব্যাকুলতা, সর্বস্ব নিবেদনের আর্তি পুরুষোত্তম পাণ্ডবকুলভূষণ মহাবীর অর্জুনকেও চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করেছিল। স্বয়মাগতা এই নাগসুন্দরীকে প্রত্যাখান করবার অভিপ্রায় অর্জুনের ছিল না অথচ প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা। নারদের সম্মুখে পঞ্চপাণ্ডব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন— দ্রৌপদীর সঙ্গে কোনও পাণ্ডবভ্রাতা একগৃহে বাস করবার সময় যদি অন্য কোনও পাণ্ডবভ্রাতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন তবে তাঁর জন্য নির্ধারিত থাকবে দ্বাদশ বৎসর বনবাস আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গ বর্জন। তাই অর্জুন একদিকে যেমন উলূপীকে প্রত্যাখানও করতে পারছেন না অন্যদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের শঙ্কায় গ্রহণও করতে পারছেন না। এমন উভয়সংকটে অর্জুন পরিস্থিতি বিচারের দায়ভার অর্পণ করলেন উলূপীর হাতেই।

উলূপী যেহেতু এই বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, তাই প্রত্যাশা মতোই প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করলেন উলূপী। উলূপী শান্ত অথচ স্থির কণ্ঠে বললেন, পাণ্ডুনন্দন, আমি জানি তোমাদের প্রতিজ্ঞার কথা। কেন তোমার দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও নির্বাসন। কেন তোমার ব্রহ্মচর্য পালন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের যে নিয়ম স্থির হয়েছিল তোমাদের মধ্যে সেটা তো শুধুমাত্র দ্রৌপদীর সম্বন্ধেই। অপর নারীগ্রহণ তো সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছের ওপর

নির্ভরশীল। পট্টমহিষী দ্রৌপদী সম্পর্কে যে নিয়ম স্থির হয়েছে তা তো আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উলূপী সংযোগ করলেন, তুমি তো ক্ষত্রিয়। পীড়িতকে পরিত্রাণ করাই তো ক্ষাত্রধর্ম। আমাকে তুমি গ্রহণ না করলে আমি বাঁচবো না। আমাকে গ্রহণ করলে আমার ঈপ্সিত এই মিলনে যদি তোমার প্রতিজ্ঞাকৃত ধর্মের অনুমাত্রও লঙ্ঘন হয়; তবুও তোমার ধর্ম নষ্ট হবে না, যদি তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। প্রতিজ্ঞা রক্ষার থেকে জীবনরক্ষার ধর্ম অনেক বড়। আমি তো আমার সর্বস্ব অর্পণ করেছি তোমাকে, তুমিও আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমার শরণাগত। আমাকে গ্রহণ করে তুমি আমাকে জীবনদান কর। প্রাণরক্ষা কর আমার। এর থেকে বড় ধর্ম আর কী হতে পারে।

অর্জুনও এবার কিছুটা বিহ্বল হয়ে, পূর্ণ করলেন উলূপীর ঈপ্সা। তবে অর্জুন বেশি সময় কাটাননি উলূপীর সঙ্গে। সেই রাত্রিযাপন করে, উলূপীর সমস্ত ঈপ্সা পূর্ণ করে অর্জুন পরদিন প্রভাতেই ফিরে আসেন গঙ্গাতীরে। অর্জুনকে সকুশলে গঙ্গাতীরে পৌঁছে দিয়ে যান উলূপী। পরবর্তী সময়ে অর্জুন ও উলূপীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হন— ইরাবান।

উলূপী ও ইরাবানের জীবনের পরিস্থিতির কথা অর্জুন অজ্ঞাত ছিলেন। সেই যে তিনি কৌরব্য নাগের আবসস্থল থেকে প্রভাতে ফিরলেন গঙ্গাদ্বারে তারপর থেকে উলূপীর সঙ্গে তাঁর সমস্তরকম সংযোগ বিচ্ছিন্ন। যদিও উলূপী সেরকম কোনও প্রত্যাশা বা দাবি কখনও করেননি অর্জুনের কাছে। বহুরকমের ঝড়ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও ইরাবানকে অর্জুনের যোগ্য পুত্রের মতো মানুষ করেছেন। অনেকটা আধুনিক যুগের সিঙ্গল মাদারের মতো। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন প্রয়োজন হয়েছে; উলূপী কালবিলম্ব না করে ইরাবানকে পাঠিয়েছেন অর্জুনের কাছে— তাঁকে সাহায্য করবার জন্য।

উলূপীর এই বীর পুত্রটি এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সাহায্য করবার জন্য। অর্জুনের সুযোগ্য পুত্র হিসাবে যথেষ্ট সমরকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইরাবান। শকুনির ছয়জন ভ্রাতাকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন মহাবীর ইরাবান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন অলম্বুষ রাক্ষসকে নিয়োগ করেন ইরাবানকে ধ্বংস করবার জন্য। অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও প্রাণ হারাতে হয় ইরাবানকে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপনের পর জ্ঞাতিহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহর্ষিরা যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়েছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার। যজ্ঞের নিয়মানুসারে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন বের হলেন যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে। কোনও রাজ্যে যুদ্ধে জয়লাভ করে কোথাও বা বশ্যতা অধিকার করে অর্জুন উপস্থিত হলেন মণিপুর রাজ্যে। মণিপুরের রাজা তখন চিত্রাঙ্গদাপুত্র বভ্রুবাহণ। বিধিসম্মতভাবে ব্রাহ্মণ মহর্ষিদের নিয়ে প্রণামীর ধন সহকারে বভ্রুবাহণ উপস্থিত হলেন অর্জুন সকাশে পরম শ্রদ্ধা সহকারে। ক্ষত্রিয় সন্তানের এমন বিনীত বশংবদ আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেন অর্জুন। এমনকি ভৎর্সনা করলেন বভ্রুবাহনকে। বললেন, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করছ।

অর্জুন যখন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করছেন তখন সহসা ভূমিভেদ করে সেখানে উপস্থিত হলেন নাগদুহিতা উলূপী। উলূপী তখন বভ্রুবাহনের কাছে গিয়ে বললেন, পুত্র, আমি নাগকন্যা উলূপী; তোমার বিমাতা। ইনি হলেন তোমার পিতা মহাবীর অর্জুন। তুমি নির্দ্বিধায় তোমার যুদ্ধভিলাষী পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাহলেই উনি প্রীত হবেন। তোমারও প্রকৃত ধর্মপালন করা হবে। করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হল অর্জুন ও বভ্রুবাহনের। তুমুল যুদ্ধ হল পিতাপুত্রের মধ্যে। কিন্তু এই যুদ্ধের ফল হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। যুদ্ধে প্রাণ হারালেন অর্জুন।

সংবাদ পৌঁছাল মণিপুর রাজমাতা চিত্রাঙ্গদার কাছে। শোকে আকুল হয়ে পড়লেন চিত্রাঙ্গদা। রণক্ষেত্রে শায়িত অর্জুনের কাছে গিয়ে বিলাপ করতে থাকলেন। বললেন উলূপীকে, আমার পুত্রকে উদ্দীপিত, উত্তেজিত করে তুমি আমার স্বামীর প্রাণনাশ করেছ। আজ আবার যদি তুমি আমার স্বামীকে জীবিত না দেখাতে পারো; তবে আমি আমার এই জীবন ত্যাগ করব। উলূপী তখন নাগজাতির পরম ভরসার সঞ্জীবন মণির স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্র সঞ্জীবন মণি উপস্থিত হল। উলূপী সেই সঞ্জীবন মণি শোকাকুল, বিহ্বল বভ্রুবাহনের হাতে দিয়ে বললেন, পুত্র ওঠো; দুঃখ কোরো না। তুমি তোমার পিতা অর্জুনকে হত্যা করনি। পিতার প্রীতির জন্যই আমি 'মোহিনী' নামে এক মায়া প্রয়োগ করেছি। তোমার পিতা অর্জুন তোমার ক্ষাত্রশক্তি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। তাই তোমাকে আমি যুদ্ধে প্রণোদিত করেছি। তোমার কোনও অনিষ্টসাধন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি এই অলৌকিক সঞ্জীবন মণিটি তোমার পিতা অর্জুনের বক্ষস্থলে স্থাপন কর। তাহলেই তুমি দেখবে তোমার পিতা আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

উলূপীর অভিষ্ট মতো বভ্রুবাহন সঞ্জীবন মণিটি অর্জুনের বক্ষে স্থাপন করলেন। সঞ্জীবন মণি বক্ষে স্থাপন করামাত্র অর্জুন যেন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করলেন। প্রাথমিক কথোপকথনের পর উলূপী এবার মূল ঘটনার রহস্যোন্মচনে তৎপর হলেন। অর্জুনকে বললেন, আমার প্রতি তুমি রাগ কোরো না। আমি যা করেছি তোমার ভালর জন্যই করেছি। তোমার পূর্বকৃত পাপের শাস্তিস্বরূপ কুমার বভ্রুবাহনের হাতে মৃত্যুবরণ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তুমি মহামতি ভীষ্মকে শিখণ্ডীর সহযোগিতায় অন্যায় যুদ্ধে নিপাতিত করেছিলে। সেই অন্যায়ের শাস্তি ভোগ না করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করতে, তাহলে কর্মফল অনুসারে তোমার নরকে গতি হত, আর আজ বভ্রুবাহনের কাছে তোমার যে অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিল, এ হল সেই পাপের শাস্তি।

অর্জুন এরপর কুমার বভ্রুবাহনকে আমন্ত্রণ জানালেন চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে সঙ্গে করে যজ্ঞে উপস্থিত থাকবার জন্য। অর্জুনের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করতে যথাসময়ে অর্জুনের দুই প্রবাসী ভার্যা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়েছেন কুমার বভ্রুবাহন। অর্জুনের স্ত্রীর পরিচয়ে এই প্রথম হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা। আর অর্জুনের এই দুই প্রবাসী স্ত্রী রীতিমত মর্যাদা ও সম্মান পেয়েছেন হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে।

সমাপন হয়েছে অশ্বমেধ যজ্ঞ। আমন্ত্রিত রাজা মহারাজারা ফিরে গিয়েছেন আপন আপন রাজ্যে। ফিরে গিয়েছেন মণিপুর নরেশ বভ্রুবাহন। কিন্তু নিয়ে যাননি তাঁর দুই মাতাকে— চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে। তাঁরা স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন পাণ্ডব আবাসে। আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে উলূপী স্থায়ী আসন লাভ করেছেন স্বামীর আবাসে। পেয়েছেন তৃতীয় পাণ্ডবভার্যার মর্যাদা।

মহাভারতের অন্তিমপর্বে মহাপ্রস্থানের পালা। দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব যাত্রা করেছেন মহাপ্রস্থানের পথে। পাণ্ডবদের অন্যান্য কুলবধূরা রয়ে গেলেন হস্তিনাপুরেই। অভিমন্যুপুত্র কুমার পরীক্ষিতের পিতামহী সুভদ্রাও থাকলেন হস্তিনাপুরে— পরীক্ষিতের

উলূপী সংযোগ করলেন, তুমি তো ক্ষত্রিয়। পীড়িতকে পরিত্রাণ করাই তো ক্ষাত্রধর্ম। আমাকে তুমি গ্রহণ না করলে আমি বাঁচবো না। আমাকে গ্রহণ করলে আমার ঈপ্সিত এই মিলনে যদি তোমার প্রতিজ্ঞাকৃত ধর্মের অনুমাত্রও লঙ্ঘন হয়; তবুও তোমার ধর্ম নষ্ট হবে না, যদি তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। প্রতিজ্ঞা রক্ষার থেকে জীবনরক্ষার ধর্ম অনেক বড়।

অভিভাবিকা হিসেবে। চিত্রাঙ্গদা ফিরে গেলেন মণিপুরে— পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে। উলূপী কিন্তু কুরুবাড়ির অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হস্তিনাপুরেও থাকলেন না আবার পিত্রালয়েও ফিরলেন না। তিনি ঝাঁপ দিলেন গঙ্গানদী বক্ষে। উলূপীর জীবনের অন্তিম পরিণতি হল গঙ্গবক্ষে। আত্মবিসর্জন দিলেন উলূপী। যে গঙ্গানদী বক্ষে প্রথম তিনি স্নানরত অবস্থায় দেখেছিলেন অর্জুনকে; আজ সেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দিলেন তিনি। অর্জুনকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসেছিলেন উলূপী। তাই মহাপ্রস্থানের পথে যখন জীবনের অন্তিম পথের পথিক হয়েছেন অর্জুন তখন উলূপীও আর রাখতে চাননি তাঁর এই পার্থিব শরীর। অর্জুন ছাড়া পৃথিবী আজ উলূপীর কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন— তাই এই নিরর্থক জীবন রাখার থেকে আত্মবিসর্জনকেই শ্রেয় মনে করেছেন উলূপী।

এমন অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, নারীর প্রেমের এমন তীব্রতার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। উলূপীর কাছে প্রেমই ছিল বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন। তাই প্রথম দর্শনেই অর্জুনকে বলেছিলেন, আমাকে গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা কর আমার। আজ উলূপীর অন্তিম পরিণতি দেখে বোঝা যায় কতটা সুতীব্র, কতটা সুগভীর প্রেমের আকুতি ছিল উলূপীর।

শুভ্রজিৎ রায়

মহারাণী কথা

রাজনগরে শিক্ষার সূচনাকাল ঈর্ষণীয়। নারী স্বাধীনতার যখন আকাল, দিকে দিকে মানুষ সংস্কারাচ্ছন্ন, বাল্যবিধবার হাহাকার, কোথাও সতীদাহ চলছে সেই সময়ে এত দূরদেশে মানুষ তথা মেয়েমানুষের দুর্ভোগের কালো মেঘ দূর করতেই যেন এলেন মহারাণী। সম্পূর্ণা এক আলোকিত নারী যিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজনগরের অন্তঃপুরের দিকে। সে রত্ন-নিন্দিত আঙুল চিহ্নিত করে দিল রাজনগরের স্ত্রীরা শুধু অন্তঃপুরিকা নয়, ঘোমটা টানা সংস্কারে আবদ্ধ নারীই নয়, তারা আধুনিক হতে চায় মন ও মননে। ফিটন চেপে অত্যন্ত যত্নবান হয়ে তারা এসে পৌঁছেছে মেম সাহেবের শিক্ষাধীন স্কুলবাড়ির বহির্দালানে। উদারতা তৈরি হয়েছে মননে, সংস্কৃতিচর্চায়, চলনে, বলনে। শিক্ষাই মূল কথা, শিক্ষাই আলো। মহারাণী তৈরি করেছেন যুগের পর যুগ রাজনগরের মাটি কুঁদে অসংখ্য মহারাণী। সেই অসম্ভব সুন্দর অট্টালিকায় রাজবধূ রাজপুত্রীরা সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন কয়েক ধাপ। এঁরা আজও জড়িয়ে আছেন রাজনগরের মননে চিন্তনে। সাগরদিঘীর চারপাশ জুড়ে হর্ম্যরাজি, শিক্ষায়তনের খিলানে খিলানে। যুগে যুগে মহারাণী জন্ম নেন, তৈরি করেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ইতিহাস আর কল্পনার মিশ্রণে মহারাণী কথার সেকাল একাল। আগামী জুলাই ২০১৮ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক লিখছেন **মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস।**

সুহাসিনীর **অম্বুবাচী**

তখন ডুয়ার্সের আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশ উপুড় করা সে বর্ষা যে দেখেছে সেই জানে। একনাগাড়ে সপ্তাহ ধরে বিরামহীন বৃষ্টির ধারাপাত চলছে তো চলছেই। হঠাৎ খানিক বিরতি, এক ঝলক মেঘভাঙা রোদ্দুর দেখা দিয়েই অদৃশ্য। কালো মেঘের আকাশ ঝুঁকে পড়ত মাটির ওপর। অঝোর জলের ধারায় ভিজে, এক টুকরো গামছা পরে, মুখে হ্যাট হ্যাট শব্দ তুলে, জমিতে চাষ লাগাতো ডেম্বু দাদা, খগেশ্বর কা, ঝরেন কা, কুকিল কা আরও আরও অনেক মানুষ। নরম মাটির বুকে লাঙলের ধারাল ফলা গেঁথে যেত, উলোট-পালট খেত বড় বড় মাটির ঢেলা। ক্রমে নরম চন্দনের মতো সেই কালচে রঙা মাটি! বীজ ধারণের জন্য প্রস্তুত তখন!

এক হাতের ছোট লাঠিতে বলদজোড়াকে নির্দেশ দেওয়া আর অন্য মুঠোয় শক্তহাতে লাঙলের প্রান্ত; জমিকে বীজ ধারণের জন্য তৈরি করে দিত মাটি ও জল মেখে মাটির সন্তানেরা। দূরের থেকে তাদের শরীর, বৃষ্টির সাদা পর্দার ওধারে কেমন জলরঙে আঁকা ছবির মতো! তখন বীজের জন্যে উন্মুখ অপেক্ষা ধরিত্রীর! আর কোটি লোকের আহারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত গুটিকয় মানুষ! গ্রামদেশে সে এক উৎসবের কালই বটে। ভরা আষাঢ়ে আকাশের, মাটির আর মাটির কাছে থাকা মানুষের— সে এক অপূর্ব উৎসব!

কৃষিপ্রধান উত্তর বাংলায় কৃষি-সম্পর্কিত অম্বুবাচী ব্রত পালনের নিয়ম দেখেছি ঠিক এসময়ে। অধিক ফলনের কামনায় ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ ব্রত পালন। জলে ভেজা মাটিকে রজঃস্বলা নারীর সঙ্গে তুলনা করে এই ব্রতর উদ্‌যাপন। আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে সূর্য মিথুন রাশিতে প্রবেশ করলে অম্বুবাচী ব্রত পালিত হয়। তিন দিন ধরে পালিত এ ব্রতের নিয়মকানুন খুব সহজ নয় বরং বেশ কঠিন! আর যথারীতি এই ব্রত পালনের দায়ও নারীদের। এবং আশ্চর্য কোন সে অজ্ঞাত কারণে অধিক ফলন বা শস্য উৎপাদন কেন্দ্রিক অম্বুবাচী ব্রত পালনের দায় বিধবা নারীদের। বিধবা নারীর সন্তান ধারণের অধিকার সমাজ আজ এই জেট-নেটের যুগেও যখন দেয়নি তবে ঠিক কোন কারণে এই উৎপাদন কেন্দ্রিক ব্রত পালনের দায় বিধবাদের ওপর বর্তে ছিল? আজ, এই সমকালেও পারিবারিক বা সামাজিক নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিধবা মহিলাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়? তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেও? কেউ কেউ নিজেকে এসব ভাবনা থেকে মুক্ত করতে পারলেও, অনেক বিধবা মহিলাকে দেখেছি নিজেকে সরিয়ে রাখেন পারিবারিক বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থেকে; ভাল লাগলেও লাল টিপ, লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ নিজেরাই পরেন না! সে কি সমাজের নীরব তর্জনীর কারণে নাকি নিজেরই মনের গভীর কোণে লালিত শত বছরের পুরনো কুসংস্কারের কারণে— সেটাই ভাববার বিষয়।

যাইহোক অম্বুবাচী প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই ব্রত বিষয়ে আমার বাল্যে খুব কাছ থেকে দেখা সুহাসিনীকে নিয়েও দু'-চার কথা বলব শেষে। অম্বুবাচীর ওই তিন দিন মাটি কাটা, জমিতে চাষ দেওয়া, গাছ পোঁতা ফসল তোলা নিষেধ। এ ব্রতে শুধু নিয়ম পালন করাই রীতি আলাদা করে অম্বুবাচী পুজো হয় না। ব্রত পালনকারীণিরা রান্না করা কোনও খাবার খেতে পারবে না। আগুন ছুঁতে পারবে না। কাঁচা দুধ, ফলমূল, সাবু ভিজিয়ে খাবে। তিন দিন পরে তাদের জামাকাপড় বিছানাপাটি সব ধুয়ে ফেলতে হবে, যেন তার রজঃকাল সমাপ্ত হল! আসামের কামরূপ কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসব হয়, হাজার হাজার ভক্তেরা আসেন। তিন দিন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। কথিত আছে এখানেই 'সতীর যোনিদ্বার' পতিত হয়েছিল। দেবী পীঠে এসময় রজঃ দেখা যায়, এমনটাই বিশ্বাস ভক্তজনের। উত্তরবঙ্গের কোনও কোনও জায়গায় আমাতি ঠাকুরের পুজো এই নামের লৌকিক অনুষ্ঠান হয়। মালদা ও উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আমৈৎ নামের এক পার্বণ পালিত হয় এ সময়। ঘরের বাইরের দেওয়ালে গোবর দিয়ে সাপের চিত্র এঁকে রাখেন ভক্তজন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, অম্বুবাচী আসলে প্রজনন শক্তির পূজা আর সাপ প্রজননের বিশিষ্ট প্রতীক।

স্বামীর দ্বিতীয়পক্ষ, সাতটি সন্তানের জননী মাতামহী সুহাসিনী ছিলেন বড় নিষ্ঠাবতী। বিনা প্রশ্নে সব মেনে নেওয়াই ছিল তার স্বভাব। বড় নীরব, বড় শান্ত আর নত হয়ে থাকা মানুষ। স্বামী বর্তমানে রান্নাঘর আর ঠাকুর ঘরটুকুই ছিল তার কর্মক্ষেত্র। স্বামীর প্রয়াণের পর ভোরে উঠে ফুল তোলা, স্নান, পুজো বেলা তিনটে নাগাদ স্বপাকে একবার মাত্র আহার; তাও নাতি-নাতনির দলকে খাইয়ে কতটা তার উদরে যেত সে এক প্রশ্ন! শখের মধ্যে বজায় ছিল খবরের কাগজ পড়া আর ক'বার চা-পান করা। চা-বাগানে বড় হয়েছেন, স্বামীও চা-বাগানের বাবু। তা এই অম্বুবাচীতে দেখতাম প্রায় উপবাসী সুহাসিনী তার শীর্ণ হাতে ধরা একটা জলভরা পাথরের বাটিতে খানিক চা-পাতা ফেলে বারান্দায়, সিঁড়িতে এখানে ওখানে রোদের আশায় দাঁড়িয়ে। কখন রোদ্দুর উঠবে ভরা বর্ষায়? কখন সে বাটির জল গরম হবে আর তিনি চা-পান করবেন? দেখেছি প্রেমদা ঠাকুমা, মনা ঠাকুমাকেও প্রায় অনাহারে তিনটে দিন কাটাতে। ফলমূল যেটুকু কাটা হয়েছে বাটি ভরে, প্লেট ভরে বিতরণ করছেন হাসিমুখে, বাড়ির ছোট-বড় সব্বাই ভরাপেটে মহানন্দে আবার খাচ্ছি অম্বুবাচীর সাগু-দুধ-ফল মাখা প্রসাদ। সত্যি জিজ্ঞেস করিনি তো তোমার খিদে পাচ্ছে না? কী দরকার অম্বুবাচী পালন করার? কী হবে তোমার এসব করে? পাথরের বাটির ওই ঠান্ডা জলে চা হয় নাকি? নাঃ কিছুই বলা হয়নি। কেউ তাদের সংস্কার ভাঙায়নি। তবে যুগ পাল্টেছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে সুহাসিনীর কন্যা রেবা, সবটা না হলেও অনেকটাই সংস্কারমুক্ত। তিনি অম্বুবাচী পালন করেন না। তাতে জগতে বর্ষার আগমনে বিলম্ব বা চাষ-আবাদে কোনও বাধা হয়েছে এমনটি শোনা যায়নি।

সৌদামিনী রায়

শালবনে রক্তের দাগ

লাল মার্কা দেওয়া ডিভিডিটা নিয়ে আমার অস্বস্তি বরাবরের। কিন্তু মেয়েটা কি সে ডিভিডি ইচ্ছে করেই এনেছে? ওটা ভালো করে দেখতে হবে। আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য একটা প্রমাণ বানানো হচ্ছে, টের পাই। একটা গ্রুপ আদাজল খেয়ে লেগেছে আমার পেছনে। ইন্দ্রকুমারও ফাঁসল। শিশু চুরির কেস। সত্যম কি মৃত্যুর আগে জেনে গেছিল সব? টানা পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কেউ চলে যাচ্ছে? একটা শব্দ পেলাম যেন পায়ের! সাগরিকা রায়ের ধারাবাহিক থ্রিলার।

৩৭

চিতাবাঘটা ঘুমিয়ে পড়েছে ফাঁদে। একচুয়ালি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়ছে। এরপর খাঁচায় পুরে ফেলে বড় গাড়ির বৈধ মালপত্রের সঙ্গে পাচার করা হবে। একটা অর্ডার আছে। নাগরুকে দিয়ে কাজটা করানো হল। অর্ডারি মাল রিলিজ করার জন্য লোক থাকবে জায়গা মতো। কাজটায় উত্তেজনা আছে। নাগরু কাজ সেরে আমাকে জানিয়েছে। আমি চলে গেলাম গাড়ি নিয়ে। আমার একখানা ম্যাটাডোর ভ্যান আছে। এখন ওটা নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে বনবস্তিতে ম্যাটাডোর ভ্যান খুব চোখে পড়বে। টাটা সুমো নিয়ে গেলাম। আজ সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি পড়ছে। ডুয়ার্সের বৃষ্টি একবার শুরু হলে তিনদিনের আগে ছাড়ে না। রাস্তা ঝাপসা হয়ে আসে চোখে আমনে। ওয়াইপার জল সামলাতে সামলাতে নাজেহাল। গাড়ি গদাধ বনবস্তিতে পৌঁছতে নাগরু এগিয়ে এল। রেইনকোটে ঢাকাঢুকু করেছে নিজেকে
—মাল রেডি। আপনি কি নিয়ে যাবেন?

—আমি নই। না না। আমি কেবল মাত্র মালবাহী গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। সেখান থেকে মাল চলে যাবে। আজ জঙ্গলে নিলামের গাছ প্যাক হবে। আমি ওই ট্র্যাক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারি।

—ঠিক আছে।

প্ল্যান মাফিক কাজ হয়ে গেল। নাগরু দুর্দান্ত পোচার। ওকে কাজ দিলে হবে না বলে কথা নেই। বাঘের জন্য ফাঁদ পেতে রাখে ও গভীর জঙ্গলে। কাঠের বড় বড় বিটের আড়ালে ঘুমিয়ে চলে গেল চিতা। এভাবে কত পার করে দিলাম। ট্রাক থেকে কারা ওকে তুলবে, সেটা পরের স্টেপ। আমার জানার কথা নয়। কাজটা সেরে ফিরে আসছি, বৃষ্টির ধারায় চোখ একদম ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হলুদ ফ্লাশার জ্বেলে গাড়িটা বাঁদিকে নিয়ে এলাম। ভিজে রাস্তায় চাকা স্কিড করতে পারে। করেও। উলটো দিক থেকে পরপর গাড়ি আসছে। আলো জ্বেলে সব গাড়ি, ট্রাক চলে যাচ্ছে চাকা থেকে জল স্প্রে করতে করতে। একলা একটা ভিনগ্রহী জীবের মতো বসে আছি।

নির্জন রাস্তায় লোক চলাচল নেই-ই বলতে গেলে। সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে বিরক্তি লাগছিল। কে একজন মহিলা ভিজে ভিজে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির তোড়ে ভাল দেখা যাচ্ছে না। জলের মধ্যে মাছের মতো এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। হলুদ শাড়ি ...! আরে! সেই... সেই মেয়েটা না? একবার পেছন ফিরে তাকাল। জলে ভেজা কাচের ভেতর থেকে খুব ভাল বোঝা যাচ্ছে না... কিন্তু ওই মুখ আমি ভুলি কী করে? গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই মেয়েটা জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল যেন। নেমে পড়ছি, দেখতেই হবে আজ ব্যাপারটা কী, এই সময় নাগরুর ফোন।

—বল।

—মাল অন্য ট্রাকে উঠেছে। কখন আসবো?

নাগরু ওর কমিশনের কথা বলছে।

—এস না। আমি বিকেলের দিকে যাব। আর বারবার ফোন করো না। সিম চেঞ্জ করে নাও জলদি।

বাড়িতে এইসব লোকের আনাগোনা ভাল নয়। এদের চিনি বলেও ভাবি না। এখন সরলাকে নিয়ে যাব ওর মেয়ের বাড়ি দুর্গাপাড়ায়। সরেজমিনে দেখে আসতে হবে ওর মেয়ে-জামাইকে। আমি খুব খারাপ লোক। সন্দেহপ্রবণ। সেটাই আমার রক্ষাকবচ।

সরলা ভাবেনি সত্যি আমি ওর মেয়ের বাড়িতে যাব। ওকে সেকথা বলতেই এদিক ওদিক তাকায় —গরীব মানুষ। কোথায় বসতে দেবে হ্যান ত্যান। তাছাড়া মেয়ে বলেছে জামাই নাকি ভাল আছে।

—আচ্ছা? তাহলে চল, একটু ঘুরেই আসি। সরলা আমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। ওকে বাধ্য করেই গাড়িতে তুললাম। এদিক ওদিক করে অনেকটা গিয়ে জল স্যাঁতসেঁতে একটা জায়গায় গাড়ি থামাতে বলল সরলা। ড্রেন আর রাস্তা একাকার। এখানে পা রাখবো কোথায়? কোনও ক্রমে নেমে দাঁড়ালাম। সরু পায়ে চলা রাস্তা গিয়ে কোথায় কোন অনন্তে মিশেছে কে জানে। সরলা সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। ঝুপড়িতে এসে থামল। বিশ্রি গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। দরজার মুখে নোংরা সিন্থেটিক পর্দা ঝুলছে ফাঁসি খাওয়া আসামীর মতো। সরলা কী বলে ডেকে উঠতে মরা মাছের মতো চোখ নিয়ে বেরিয়ে এল সরলার মেয়ে। হয়ত। অপুষ্ট শরীরে ময়লা জামা কাপড়, শুকনো মুখে দাঁত বেরিয়ে আসা চেহারা। আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু।

—তোমার স্বামী কোথায়? ডাকো দেখি।

আমার গলা শুনে হাড় জিরজিরে লোকটা বেরিয়ে এল। দেখলেই গাঁজাখোর মনে হয়। রক্তাভ চোখ।

—কী হয়েছিল?

—জ্বর! লোকটা সরলার দিকে তাকাল। যেন সমর্থন চাইল।

—সেরেছে?

—সেরেছে।

সরলার মেয়ের হাতে দুশো টাকা দিয়ে এলাম। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি নোংরা বিছানা। একেবারে ভিখিরির সংসার। গা ঘিনঘিন করে উঠল।

বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। সরলা কিছু বলছিল ওদের। আমি অপেক্ষা করছিলাম গাড়িতে বসে। এত গরীব এরা, অথচ সরলার সঙ্গে ফোনে কথা বলে! ফোন ব্যবহার করার পয়সা কোথায় পায়? সরলা আসছে। আমি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালাম। সরলা গাড়িতে উঠে বসার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরলার মেয়ের কাছে গিয়ে ওদের ফোন নম্বর চাইলাম। ওরা থতমত খেয়ে বলল —আমাদের ফোন নেই বাবু!

—তাহলে মায়ের সঙ্গে কথা বল কেমন করে?

—আমরা... মানে...! কী বলবে বুঝতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—ফোনে কথা হয় না? কাল ফোন করনি? বেশ। একটা ফোন কিনে নিতে পার তো।

—খাওয়া জোটে না! ফোন! লোকটা বউয়ের দিকে তাকাল।

—বেশ। আসছি। ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। দেখি সরলা উদ্বিগ্ন চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। গাড়িতে বসে আমি মনে মনে হাসলাম। গতরাতে সরলার ঘরের দৃশ্য আমি দেখেছি। সিসিটিভি সরলাকে দেখিয়েছে। কানে ফোন চেপে কথা বলছে সরলা। মেয়ে-জামাই মিথ্যে বলবে কেন? যদি ওদের কাছে ফোন না থাকে তাহলে সরলা কার সঙ্গে কথা বলছিল? মেয়ে জামাই মিথ্যে বলছে কি?

বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত সরলার সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি। হুক্কা বারে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওখানে গিয়ে একধারে বসে নানান কিসিমের মানুষ দেখি। মদ্যপান করে মত্ত অবস্থায় মারপিট, অশালীন হাবভাব... ভারি মজা। আজ ইচ্ছে করছিল মত্ত-মানুষ দেখতে! কিন্তু যেতে হলে অনেকটা দূরে যেতে হবে। নাগরু ওখানে থাকবে। ওকে পেমেন্ট করতে হবে। চলে যাব। ঘণ্টাখানেক পরে আসছি ফিরে। সময়টা ভালই কাটল। নাগরু ছিল একধারে। ছায়া আলোর মধ্যে কিছু উন্মত্ত মানুষ ছোটাছুটি করে নাচছে। আমাদের কাজ হয়ে গেল। এবারে ফেরার পালা।

বইপত্র টেনে নামালাম। সরলা নিজের ঘরে গেছে। নিশ্চয় দরজা বন্ধ করে ফোনাফুনি চলছে! কাকে জানাচ্ছে আজকের ঘটনা?

রাতটা গভীর হয়ে এল। অন্যান্য দিনের মতই বেশি রাতে শুতে গেলাম। ঘুম আসছিল না। সরলা... সরলা কে? কেন মিথ্যে বলছে ও? অঙ্কটা কঠিন নয়। সোজা অঙ্ক। কিন্তু কোথায় এসে যেন আটকে যাচ্ছে!

শব্দটা হল আগের দিনের মতই। কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে। রিভলবার হাতে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। একজন মনে হচ্ছে! আজ আমাকে জানতে হবে কে বা কারা আসছে আমার বাড়ির অন্দরে? দরজার ভেতরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। সরলা কোথাও যাচ্ছে কি? এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলে বেরিয়ে আসি। বারান্দা ফাঁকা। কোথাও কারও চিহ্ন নেই! কী হচ্ছে আমার সঙ্গে? স্পষ্ট শুনেছি পায়ের আওয়াজ। বাড়ির সব জায়গা খোঁজাখুঁজি করে কিছু না দেখে চিন্তিত মনে আসছি বেডরুমের দিকে। মনে হল ব্যালকনিতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সিল্যুট মূর্তি। পেছন ফিরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে! সরলা নয়। কে? কে ওখানে? চেঁচিয়ে উঠতেই ছায়া ঘুরে তাকাল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কানু! কাঠ মিস্ত্রি কানু।

আমি চমকে উঠতেই হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। সেই শব্দে ঘোর কেটে গেল যেন। দেখলাম একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা বারান্দায় হু হু বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে।

৩৮

রুক্মিণীর ফোন বেজে চলে। কেউ রিসিভ করে না। কতদিন হল রুকু এখান থেকে গেছে? সত্যমের মৃত্যুর পরেই তো! একবার নিজে থেকে ফোন করেনি। আমার ফোন রিসিভ করছে না! প্রবলেমটা বুঝতে পারছি না। হল কী? যে ঠিকানায় ও থাকে, সেখানে যাব? নাঃ! এত বেশি ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না। আসে যদি ভাল, না এলেও ক্ষতি নেই। কেঁচো খুঁড়ে কেউটে বের করা আমার কাজ না। আর আমার এখানেই থেমে থাকার কথা না। কে বা সত্যম, কে বা রুক্মিণী! যাক, যা গেছে তা যাক। ওদের গন্তব্যে ওরা চলে গেছে। বেশ করেছে। সুভদ্র, দিস ইজ নট দ্য এন্ড ওফ ইয়োরস।

সরলা রানি ইদানিং আমার থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এভাবে লুকোচ্ছে কেন জানতে চাই না। সরলার টাইম আসছে। কানু দেখা দিয়ে সেই ইঙ্গিত কি দিয়ে গেল? মর্নিং ওয়াকের দিকে তেমন আগ্রহ নেই আমার। একটু আধটু ওয়ার্ক আউট করে থাকি। আজ ভোরে উঠে পড়ে সরলার ঘরের ছবি দেখে নিলাম। সরলা ঘুমোচ্ছে অকাতরে। বেরিয়ে এলাম। এত ভোরে বাইরে যাব, ভাবেনি সরলা। উঠে চা নেব কিনা জানতে চায়নি। গাড়ি বের করে নিলাম। অনেকটা যাব। কাজেই হেঁটে পারব না। রাস্তাটা মনে আছে। মোবাইলে রুট দেখে নেব দরকারে। জায়গাটার নাম দুর্গাপাড়া। এটুকুই যথেষ্ট।

ড্রাইভ করছি। ক্রমে ঢালু রাস্তায় নামছে গাড়ি। আজ বৃষ্টি হয়নি। প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা নেই। রাস্তা সরু হয়ে যাচ্ছে। ড্রেন থেকে জল-পচা গন্ধ বের হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে অনন্তগামী সরু পথটা খুঁজে বের করেছি। এখানে বেশির ভাগই ঝুপড়িতে থাকে। নোংরা বিদঘুটে গন্ধে ভরা রাস্তার শেষের দুটো ঝুপড়ির আগেরটা সরলার মেয়ের ঝুপড়ি। ঝুপড়ির মুখে নোংরা সিন্থেটিক পর্দা ঝুলছে ফাঁসিতে লটকানো আসামির মতো। বাইরে থেকে ডাকি —সরলার মেয়ে আছো? কোনও জবাব নেই। নিঝুম হয়ে আছে ঝুপড়িটা। ওঠেনি ঘুম থেকে? আবার ডাকি। ডাকতে ডাকতে থেমে যাই। কী হল রে! ভেতরে কেউ কি নেই নাকি? এত ভোরে গেছে কোথায়? আমার হাঁকডাকে পাশের ঝুপড়ি থেকে ভিখিরি টাইপ ছিরকুটে লোক বেরিয়ে এল। পাতাখোরের পাড়া নাকি এটা। বিজনেসটা ভালই। কাস্টমার আছে।

—বাবু, কেরে খোঁজেন?

—এই ঝুপড়িতে যারা থাকে সরলার মেয়ে-জামাই। জামাই অসুস্থ!

—মেয়ে জামাই? এইটা তো বুধুর ঘর। ভাড়া দেয়। দুইদিন একটা মেয়েছেলে আর গাঁজাখোর নেত্য ছিল। ওরা কার মেয়ে জামাই? নেত্য টিশনের ধারে পড়ে থেকে ভিক্ষা করে। আর ওই মেয়েছেলেটা কে জানিই না। দুইদিন পরে চলে গেছে ওরা। দুইজন দুইদিকে গেছে। একটা লোক আসছিল। মেয়েটারে নিয়া গেছে। নেত্য আছে টিশনে, ভিক্ষা করতেছে।

—সে কি? কোথায় গেল।

—কী জানি। ঠোঁট উলটে ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। ঝুপড়ির ভেতরের ময়লা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম। বিছানা পরে আছে মরা মানুষের মতো। কেউ নেই কোথাও।

ফিরে এলাম। হাঁক দিয়ে চা চাইলাম সরলার কাছে। সরলা তড়িঘড়ি চা নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম— আজ তোমার মেয়ের বাসায় যাব। তুমি যাবে? কিছু ওষুধপত্র দিয়ে আসব।

সরলা হেসে বলল ওরা নাকি তীর্থ করতে পুরীতে গেছে। এখন আর দেখা করতে যাওয়ার দরকার নেই।

সরলা গরলে ভরা। এই গরল ভরে দিচ্ছে কেউ।

—তাহলে নেত্যই তোমার জামাই?

সরলা নিমেষে ফ্যাকাশে —নেত্য কে?

—আমিও ভাবছি নেত্যটা কে! চায়ে গভীর চুমুক দিলাম —তারপর সরলা, আমার বাড়িতে কাজের লোক দরকার, সেটা কে বলেছিল তোমাকে?

—কে বলেছে... মনে নাই আমার।

—আচ্ছা, মেয়ে তোমার নয়। কেউ ওকে দিয়েছিল। এখন সরিয়ে নিয়ে গেছে। কেন এমন সাজিয়ে দেখালে আমাকে? হা হা, তুমি আমাকে চেন সরলা? এই যে, তোমার ফোন। পকেট থেকে সরলার ফোন বের করলাম— স্মার্ট ফোন। দামি ফোন। কে দিয়েছে? কল লিস্ট ডিলিট করে দিয়েছ। বাহ! এমন বোকা সেজে থাক কেন?

—ও আমারই মেয়ে...! সরলা দুর্বল চেষ্টা করে।

—তাহলে এতগুলো শাড়ির থেকে একটি শাড়ি মেয়েকে দিলে না কেন? মেয়ের তো লজ্জা নিবারণের অবস্থা নেই! কোনও মা এটা পারবে? তুমি কাকে ফোন কর সরলা? জামাই ভিক্ষে করে। ফোন নেই ওদের। তাহলে? সারা রাত ফোন করে কাকে খবর দাও? কী খবর দাও?

সরলা কাঁপতে থাকে থরথর করে। একটা শব্দ বের হয় না মুখ থেকে।

—সেদিন অনেক রাতে কোথায় গিয়েছিলে? কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? কারা রাতের বেলা আসে আমার বাড়িতে? জবাব দিতে না চাইলে দিও না। কিন্তু এই সব প্রশ্নের জবাব আমি নিজে জোগাড় করে নেব। তুমি ভুল জায়গায় এসেছ সরলা। ঠিকঠাক বল। ছেড়ে দেব। না হলে এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও আর যেতে পারবে না। বাইরের দুনিয়া একদিন ভুলে যাবে তোমাকে। আমি হাসতে থাকি। হাসতে হাসতে দেখি সরলা দৌড়ে পালাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে।

একটা গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছি। কে এল! কারও আসার কথা না! ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি গেট খুলে দিচ্ছে আমার সিকিউরিটি গার্ড। রুক্মিণী এসেছে? আশ্চর্য! এসময়ে এল যে! রুক্মিণী উঠে আসছিল। হালকা কার্ল হেয়ার স্টাইলের সঙ্গে ম্যাচ করে বড় দুল পরেছে। লং লেয়ার ড্রেস আর গ্রে কালারের শর্ট কুর্তি। রুক্মিণীকে দেখতে গিয়ে সময় কেটে যায়। মন চনমন করে উঠল। উঠে দাঁড়ালাম —হাই সুইটি! কোথায় ছিলে ডার্লিং? তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম।

—সিওর?

—মানে?

—তুমি আমাকে খুঁজছিলে? কেন? সত্যমের অবস্থায় ফেলবে বলে?

—কী বলছো?

—আমি সব জানি! সব। পল্টুকেও চিনি। ভয় পেলে নাকি? এখন আমি যা বলব, তুমি সেটাই করবে তো? রুক্মিনী হাসে —আমি সব জানতাম। আসলে আমিও চেয়েছিলাম সত্যম মরে যাক। আমাকে ইউজ করে করে ওর লাইফ সিকিওর্ড করেছে। আমি কী পেয়েছি বল?

—আমিও সেটাই ভেবেছি। সত্যম আমাকে ঠকিয়েছে। ব্যস। আর কেন ওকে বাঁচিয়ে রাখা?

আজ রুক্মিণীর প্রিয় টাকিলা বের করেছি। রাতের আমেজ তৈরি করছি। জমে উঠেছে ফোয়ারা খুশির। সরলাকে ডেকে চিকেন পকোড়া বানাতে দিলাম। রুক্মিণী জোর করে টাকিলা খাইয়ে দিল সরলাকে। সরলা মদ খেয়ে বুম মেরে গেল। অনেক নাড়াচাড়া করাতে কেবল চিলাপাতা শব্দটা উচ্চারণ করেছে।

আমি চমকে উঠলাম। চিলাপাতা মানে কী বলতে চায় সরলা? এই নারী আমার পাশে বসে আছে। এ আমার গুপ্তকথা জানে। আমি একে বাঁচিয়ে রাখতে পারি? যারাই আমার পথের কাঁটা হয়েছে, তাদের কাউকে বাঁচতে দেব না। দিইনি। তাহলে এই বা কেন সাজুগুজু করে বেঁচেবর্তে থাকবে?

রুক্মিণীকে জাগালাম। নেশা পরে করো। এমন বৃষ্টির রাতে মৌজ মস্তি না করলে কি চলে?

রুক্মিণী অশ্লীল হাসল।

—আজ বাইরে যাব। সরলাকে নিয়ে চল। সরলা অনেক কিছু জেনে গেছে। ও আর বাঁচবে না।

রুক্মিণী সজাগ হয়ে গেল।

—কখন যাবে? এখন?

—এখন। একটু বেশি করে মদ গিলিয়ে দাও। রাস্তায় ফেলে দেব। নয়তো রেল লাইনে। সিকিউরিটিকে বাইরে পাঠাও তুমি মদ আনতে। রাস্তা ক্লিয়ার।

৩৯

ঘন অন্ধকার রাতের একটা রূপ আছে। সেই অন্ধকার কথা বলে। বলে আরও অন্ধকারে ঢুকে যেতে। রুক্মিণীকে দিয়ে সিকিউরিটিকে বাইরে পাঠালাম। রুক্মিণীর গাড়িতে সরলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে নীরব নির্জন এলাকায় গিয়ে সরলাকে স্লিপারের ওপর শুইয়ে দিলাম। সরলা অস্ফুটে কিছু বলে উঠল। বলুক। অনেক দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ আসছে। আমরা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছি। সরলার অন্তিম চীৎকার শুনে তবেই শান্তি। ওর মুখ থেকে কথা বের করার থেকে সহজ হল ওকে সরিয়ে দেওয়া। তাতে যার আঁতে ঘা লাগবে, সে সামনে আসবে। মুখোমুখি কথা বলতে আসবে? না, তবে আসবে যে বেশেই আসুক না কেন। আমার এইসব লোকের হাঁটু ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। গুঁড়ো হাঁটু নিয়ে কতদূর যাবি, যা। লেংচে লেংচে যা। হা হ আহ! উফ!

লাইন কাঁপছে। হাত ছুঁয়ে দেখে নিলাম। রুক্মিণী এসব জানে না। আমাকে দেখে নিজেই ছুঁয়ে দেখল—ট্রেন আসছে!

—চুপ। কোনও শব্দ নয়। এখানে মৃত্যুযজ্ঞ চলছে। শব্দ করো না।

আমরা দেখলাম ট্রেন আসছে। একেবারে সামনে চলে এসেছে। রুক্মিণী ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল —সুভদ্র, ওকে বাঁচাও!

—পাগল? ওকে বাঁচাতে গেলে আমাকেই যে মরতে হয়! বরং তুমি চেষ্টা করে দেখ। আলগা করে নেশাগ্রস্ত মহিলাকে ঠেলা দিয়ে সরলার পাশে শুইয়ে দিলাম। আর্ত চীৎকার ডুবে গেল ট্রেনের হুইসিলের তীব্র আওয়াজে।

ব্যাস। কানু মিস্ত্রি। কাজ শেষ। তোমার ইশারা বুঝেছি গুরু। থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ। অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে পড়ে গাড়ির কাছে এলাম। রুক্মিণীর গাড়িটা কোথায় রাখি? হুমম, এখানেই থাকবে? থাকুক। সিকিউরিটি গার্ড জানাবে রাতে ম্যাডাম চলে গিয়েছিল। ও মদ কিনে এনে দেখে ম্যাডামের গাড়ি নেই। চলে গেছেন উনি। আমি বলব, এসে চলে গেছে। সাক্ষী তো আছেই। আর সরলা? ধুর, আমি কী জানি? ওর নাম সবিতা বলেছিল। আর কিছু জানি না। কাজ চেয়েছিল। বহাল করেছিলাম। তবে ওরা দু'জন একসাথে কেন যাচ্ছিল, সেটা বলতেই পারবো না। হয়তো সরলাকে নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। দিল্লিতে কাজের লোকের খুব ডিমান্ড। সিগন্যাল না দেখে লাইন পার হচ্ছিল কি? মনে হয়, লাস্ট মোমেন্টে সরলা রুক্মিণীর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে গাড়ি থেকে নেমে চলে যাচ্ছিল। তখন রুক্মিণী ওকে ধরতে যায়। ইন দ্য মেইন টাইম গাড়ি

অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছিল পরম আদরে। নিষ্পেসিত হতে ভাল লেগেছিল। অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। আয়, আমার কাছে। সব পাবি। সব দেব। জড়িয়ে পড়লাম স্মাগ্লিং চক্করে। মাত্র তিনজন ছিলাম দলে। নাম দিয়েছিলাম রামদা বাহিনী। আমি, রাঘব আর শম্ভু। শম্ভু রামদা দিয়ে গলা নামাতে ওস্তাদ ছিল। কিন্তু আমাকে হাতে খড়ি দিতে হল।

চলে আসে! এটা আমার মনে হচ্ছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন দু'জনে পালিয়ে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সবিতা ভাল মানুষ ছিল।

কখনও খারাপ কিছু দেখিনি। কাজকর্ম ভাল করতো। রুক্মিণী আমার সামনেই মজা করে সরলাকে ওর সঙ্গে যেতে বলছিল। আমি স্রেফ মজা ভেবেছি। আমি ঘুমোতেই ওরা! কেন যে পালিয়ে যাচ্ছিল রুক্মিণী! আমাকে যদি বলতো তোমার মেয়েটাকে আমাকে দাও, আমি দিয়ে দিতাম!

অধ্যাপক হিসেবে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। পুলিশ আমার কথায় অবিশ্বাস করার কিছু পায়নি। বিশেষ করে সিকিউরিটি গার্ড নিজে হলফ করে বলেছে ওকে মদ আনতে পাঠিয়েছিল ম্যাডাম। ও ফিরে এসে ম্যাডাম বা ম্যাডামের গাড়ি কিছুই দেখতে পায়নি! আসলে মনে হয় কাজের বউকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল ম্যাডাম। সেটা যাতে গার্ড দেখতে না পায় তাই ওকে সরিয়ে দিয়েছিল গেট থেকে।

সুপার্ব সুভদ্র! খুব সহজভাবে কঠিন কাজ করে ফেললে। নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিলাম।

বাড়িটা ফাঁকা। রান্নাবান্নার লোক চাই। আপাতত নিচ্ছি না। হোম সার্ভিস চলছে। একটা লম্বা লোক বাইকে করে এসে দু'বেলা খাবার দিয়ে যায়। হালকা রান্না।

একটা বদ অভ্যেস হয়েছে। রোজ রাতে ডিভিডিটা দেখা চাই। সেই জঙ্গল, মৃত্যুভয়ে কাতর লোকটার চাউনি আমাকে তীব্র আকর্ষণ করে। অন্ধকার ঘরে পর্দা থেকে প্রতিফলিত আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। লোকটার ভয়ার্ত চোখের মণি কী উজ্জ্বল! আলোর তীব্র রেখা কি লোকটার চোখের মণি থেকে আসছে? এই জঙ্গল... কেমন নেশা ধরানো ঝিমঝিমে! আমি একবার যাব ওখানে। ওই জঙ্গলে। ওটা চিলাপাতা ফরেস্ট! যাওয়ার আগে একবার কলকাতায় যাব। রাঘবকে সঙ্গে নিয়ে যাব চিলাপাতায়। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই ঘটনার সময়ে রাঘব আমার সঙ্গে ছিল। তখন আমার বয়স অনেক কম। বোধহয় নিজের হাতে প্রথম মানুষ মেরেছিলাম সেদিন। তারপরে কালজানি দিয়ে কত জল বয়ে গেল! কত ঘটনা, কত রক্তে স্নান করে ফেললাম!

সেই ছেলেবেলায় সাপ কিনেছিলাম যেদিন, যেদিন কৃষ্ণা পিসি আর মেসোকে শঙ্খ লাগতে দেখেছিলাম, সেদিন অন্ধকার আমাকে টেনে নিয়েছিল ওর গোপন গহ্বরে। একদিকে মা, বাবা, দাদুর আলোময় ঘর, অন্যদিকে একটা অন্ধকার ঘরের তীব্র রহস্য। আমি কখন সেই রহস্যের টানে ভেতরে পা রেখেছিলাম, আর ফিরে যেতে পারিনি আলোর ঘরে। অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছিল পরম আদরে। নিষ্পেসিত হতে ভাল লেগেছিল। অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কানু। কানুরে কানু /তু হ্যায় মেরা জানু। ফিসফিস করে কথা বলেছে অন্ধকার। আয়, আমার কাছে। সব পাবি। সব দেব। জড়িয়ে পড়লাম স্মাগ্লিং চক্করে। মাত্র তিনজন ছিলাম দলে। নাম দিয়েছিলাম রামদা বাহিনী। আমি, রাঘব আর শম্ভু। শম্ভু রামদা দিয়ে গলা নামাতে ওস্তাদ ছিল। কিন্তু আমাকে হাতে খড়ি দিতে হল। নিজেদের গাড়ি ছিল না। বীরপাড়া থেকে গাড়ি ভাড়া করেছিলাম। যেতাম সোজা চিলাপাতা ফরেস্টে। ড্রাইভার ভাল টাকা পেত। চুপ করে থাকতো। একদিন সেই ড্রাইভারকে পেলাম না। অন্য একজনকে নিয়ে যেতে হল। গভীর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেলাম। একটা চোরাচালানের টাকা বাঁটোয়ারা হবে। ডিকি থেকে টাকার বস্তা বের করল রাঘব। ওই রেকর্ডিং করা ছবির পাতাশূণ্য গাছে লোকটা বাঁধা, সেই গাছের নীচে বসে মদ খেলাম। বিরিয়ানি খেলাম। মাংস। টাকা বাটোয়ারা হল। এমন সময় শম্ভু ইঙ্গিত দিল এই ড্রাইভার এসবের কিছুই জানে না। সে গিয়ে গল্প করবে। লোকটা এত টাকা দেখেছে! এমন একটা সাক্ষী থাকবে বেঁচে আমাদের সর্বনাশ করার জন্য।

আমার ওপর ভার পড়েছিল লোকটাকে সরিয়ে দেওয়ার। হাত বেঁধে সেই গাছে আটকে রাখা হল। গুলি করলাম। আঃ! আঃ! কি রক্ত! রক্তে লোকটা স্নান করছিল। আমিও দু' হাতে রক্ত মেখে নিলাম। কাঁচা রক্তের গন্ধে উন্মাদ হয়ে গেলাম যেন। লোকটাকে শুইয়ে লোকটার বুকের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলাম। বুকের পাঁজর ভাঙার শব্দ পেলাম। আঃ! কি আনন্দ রে শালা!

আমাকে দেখে রাঘবরা ভয় পেয়ে ভেবেছিল আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি। নারে ভাই। আরেক নয়া দুনিয়ায় পা রাখার আনন্দ কি কম বল? এখন মাথা ঠান্ডা হলে ভাবলাম বডিটা কী করি! শম্ভু গর্ত খুঁড়ে ফেলল। রাঘব চলে গেল কোথায়। খানিক পরে ফিরে এল সিমেন্ট বালি নিয়ে। ঝোরার জল দিয়ে বালি সিমেন্ট মেখে স্ল্যাব তৈরি হল। গর্তে বডি ঢুকিয়ে স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেওয়া হল। ওপরে বিছিয়ে দেওয়া হল রাশিরাশি শুকনো পাতা। গাড়িটা জঙ্গলের আরও আরও গভীরে রাখব ভেবে সেটা করলাম না। তাতে প্রমাণ জঙ্গলে আছে বোঝা যাবে। গাড়ি চেপে তিস্তা বাজারে

এসে ছেড়ে দিলাম। অন্য গাড়ি করে ফেরার পথে আমরা চলে গেলাম মংপং। সেলিব্রেট করতে হবে।

সেই সব দিন হুড়মুড় করে চলে এল চোখের সামনে। সেই লোকটা! ও হো হো মাই ডিয়ার, মনে পড়েছে তোমাকে! তোমার ওই ভয়ার্ত চোখ আমাকে উন্মাদ করে দেয় ফ্রেন্ড। কী করব বল? আরামসে রহ।

রুক্মিণী আর সরলা নিজের দোষে মরল। কাউকেই আমি মারতে চাইনি। ওরা আমার খবর নিতে এসেছিল। স্পাই দেখতে পারি না। ড্রাইভারকে মরতে হত। নো। কিন্তু গাড়ির ভেতর থেকে নজর রাখছিল আমাদের দিকে। শম্ভু লাকিলি সেটা দেখেছিল! আচ্ছা, শম্ভু এখন কোথায় আছে? ব্যাটার এইডস হয়েছে শুনেছিলাম পাঁচ বছর আগে। হো গয়া খতম! নিজের গলা নিজেই কেটে ফেলেছিল ওই রামদা দিয়ে।

৪০

ইদানিং মাঝে মাঝেই নিখিলকে দেখতে পাই। চিলাপাতা ফরেস্টে গিয়েছিলাম। ঘুরতে। ফরেস্টের গার্ড সুবিনয় আমাকে ভাল করে চেনে। আদর যত্ন করে ফরেস্ট দেখাতে নিয়ে গেল। আমি যেদিকটা দেখতে গিয়েছি, ও অন্য দিকটা দেখাচ্ছিল। দেখুন স্যার নল রাজার গড়। প্রাসাদ আর কিছু নাই। চিলা রায়ের কথা আপনি সবই জানেন। তাঁর নামেই এই ফরেস্টের নাম। সুবিনয় নাগাড়ে বকবক করেই চলেছে। আমি সেই হত্যালীলার বৃন্দাবন খুঁজে যাচ্ছি। এখন জঙ্গল আগের মত অতটা ছমছমে নেই। কিন্তু তাহলেও দিনটা মেঘলা বলেই হোক, বা আমার মন রক্ত-গন্ধ পাচ্ছে বলেই হোক, ভারি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেমন থমথমে ভাব! যেন এখনই ভয়ঙ্কর নারকীয় কিছু ঘটবে!

বনের গন্ধটা ভীষণই টানছে আমাকে। নিজে নিজে এদিক ওদিক একটু ঘুরছি। সুবিনয় সাবধান করে দিল —ভেতরের দিকে যাবেন না স্যার! সামনের দিকে থাকবেন। সামনের দিকে এখন আছি। কিন্তু একটা সময় ছিল ওই ঘন জঙ্গলেই যেতাম আমরা। টাকা পয়সা ভাগ হত।

ঘন জঙ্গলের ভেতরে গিয়েছিলাম সেদিন। ওখানে এখন কী আছে, জানতে ইচ্ছে করে। কী গভীর অরণ্য! ক্লোরোফিলের গন্ধে ভরপুর। বুনো লতা একগাছকে আশ্রয় করে অন্য গাছকে জড়িয়ে ধরে আছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। একটা গাছের নীচে দাঁড়ালাম। বিশাল পাতায় ছায়া এখানে এখন কালো রং নিয়েছে। অঝোর বৃষ্টির জলে বনের স্নান শুরু হল। আনন্দে হাত পা মেলে মাথা দুলিয়ে নৃত্য করে চলেছে গাছেরা সবুজ পোশাকে। আমি একা দর্শক। সুবিনয় চলে গেছে আমাকে এখানে দাঁড়াতে বলে। বোধহয় ডিউটির সময়ে ওকে ওর নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে। ভালই হল। কেউ পেছনে দাঁড়িয়ে খবরদারি করছে, এটা ভাল লাগে না আমার ।

বৃষ্টি একটু ধরেছে। জল জমে গেল। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। বন ভিজে উঠে কামযাতুর হয়ে আছে যেন। আমার মনে হল সুবিনয় আসার আগেই একবার ঘুরে আসতে পারি সেই জায়গায়! ওখানে কি এখনও কোনও চিহ্ন আছে সেদিনের মৃত্যু যজ্ঞের? কিছু কাগজ? কিছু সিগারেটের অংশ? বিয়ারের টিন? আমি দেখলেই চিনতে পারব ওগুলো আমাদের সেদিনের ব্যবহৃত জিনিস কিনা। খুব খুব ইচ্ছে করছে বনের ভেতরে ঢুকে যেতে। উফ, কী দারুণ মজায় কাটিয়েছি সে দিনগুলো! উত্তেজনা ছিল জীবনে! লোকটা মৃত জেনেও ওকে হাতের বাঁধন খুলে শুইয়ে দিয়েছিলাম। রাঘবও ছিল। দু'জনে একই সাথে করেছিলাম। আর ব্যাটা শম্ভু রামদা উঁচু করে মরা লোকটার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করেছিলাম। না, না, শম্ভু, ওভাবে নয় ওভাবে নয়। সেলিব্রেট করতে হয় এইভাবে। বলে মৃত লোকটার বুকের ওপর উঠে মরণ-নৃত্য শুরু করেছিলাম। ধাই ধাই নৃত্য। একবার আমি নেচে নীচে দাঁড়াই। তো রাঘব ওঠে। নাচে। ওর পরে ওঠে শম্ভু। লোকটার পাঁজর ভেঙে চুরমার। পট মট করে পাঁজর ভাঙার শব্দ পাচ্ছি আর উল্লাসে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। সে এক দিন গেছে সত্যি! এরপরে আমরা আলাদা হতে থাকি। আমার সন্দেহ হয়, এভাবে চললে রাঘব বা শম্ভু যে কোনও দিন ধরা পড়ে যাবে। আর সেই পুরনো কথা, কান টানলে মাথা আসে! আমি চলে আসব সামনে! নিজেকে বাঁচাতে আলাদা হয়ে গেলাম। সবাই সব জানবে, এমন কোনও দাসখত লিখে দিইনি যে আমাদের চিরকাল একসাথে থাকতে হবে! রাঘব আর শম্ভু মেনে নিয়েছিল আমার কথা। ওদেরও নিজস্ব বিজনেস ছিল। রাঘব ধীরে ধীরে সুপারি কিলার হয়ে গেল। ব্যবসা বাড়াল। আর শম্ভু নারী পাচারকারী। একটা সময় টাকার লোভে নিজের মেয়েকেও বিক্রি করেছে শম্ভু।

বৃষ্টি এখন ঝিরিঝিরি নাচছে। গাছের তল থেকে বেরিয়ে এলাম। কোন দিকে যেতাম তখন? এদিক দিয়ে কি? চারপাশে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছি। অসম্ভব জোঁক থাকে এসব বনে। জল পেয়ে ঘাস গজগজ করছে। ওরই ভেতরে ভেতরে জোঁক রয়েছে। একবার লেগে গেলে রক্ত শুষে নেবে। রক্ত শুষে নেওয়ার কাজটা দারুণ! হা হা হা!

হুম, এদিক দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা ছিল। এখন সেটা দেখতে পাচ্ছি না। টুরিস্ট আসে। সুতরাং চেহারায় খানিকটা ভব্যতা আনার চেষ্টা হয়েছে। তবু বুনো গন্ধ আছে। আমাকে দেখেই যেন পাগল পাগল হয়ে উঠেছে বন। এই গহীনে কত কাজ করেছি, ওরা জানে! দেখেছে! সাক্ষী থেকেছে! সেই সব গাছেদের মধ্যে কেউ কেউ তো আছেই যারা সেদিনের সাক্ষী? সেই গাছটা কোথায় যেটাতে ট্যাক্সির ড্রাইভারটাকে বেঁধেছিল শম্ভু? উফফ, সেই গাছকে খুঁজে বের কর হে সুভদ্র স্যার। কুইক কুইক। পা চালিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছি। একটা ময়ূর কাচ ভাঙার মতো শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের গাছের থেকে। প্রথমে চমকে উঠলেও সামলে নিলাম। বৃষ্টির জল গায়ে পড়েছে। উল্লাসে নাচবে ও। অনেকটা আমার মতো। লোকটার রক্ত দু' হাতে মেখেছিলাম! কেমন আঁশটে নোনতা গন্ধ!

আচ্ছা! এদিকটা খানিকটা চেনা চেনা লাগছে। যদিও ফরেস্টের সবটুকুই অনেকটা একই রকম! একদিকে দাঁড়ালে অন্যদিকটা চেনা যায় না। আলাদা করে বোঝা যায় না। এই যে! ওখানে একটা ঝোরা দেখতে পাচ্ছি। যখন আসতাম, তখনও ঝোরা দেখেছি। বনের ভেতরে এমন থাকে। ঝোরা দেখছি মানেই যে এদিকেই সেই রাস্তা ছিল, সেটা মনে করার কারণ নেই!

ফের মেঘ করে এসেছে। চারপাশ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বনের ভেতরে দিনেদুপুরে অন্ধকার নেমে এল। সূর্যের গ্রহণ লাগলে এমন হয়! আমি বুঝতে পারছিলাম না ঝোরার কাছে যাব কিনা! লোভ হচ্ছে খুব। জোর করেই পা বাড়িয়ে দিলাম। সরু ঝোরার গায়ে পড়ে আছে গাছের পচা ডাল। লতা ডুবে আছে। ঝোরাটা যেখানে শুরু, সেখানে পেছন ফিরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ফরেস্ট গার্ড নিশ্চয়। আমি ভাল করে দেখতে গেলাম লোকটাকে। লোকটা আমার ডাক শুনতে পেল না। আস্তে আস্তে ঝোরার জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে দিল। সেই আধো অন্ধকার বন। একটা অচেনা অস্পষ্ট মানুষ... আমার ভারি অবাক অবাক লাগছে। কে এ? আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল। আমার শরীর কেঁপে উঠল। নিখিল! নিখিল এখানে? এখন?

ডেকে উঠলাম —নিখিল!

ডাকতেই আমার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল নিখিল। বনের ছায়া ছায়া অন্ধকারে মিশে গেল ও। এইমাত্র ছিল, এখন আর নেই? *(ক্রমশ)*

স্কেচ: দেবরাজ কর

PACKAGE TOUR 2018

Silk Route Tour
(Siliguri to Siliguri)

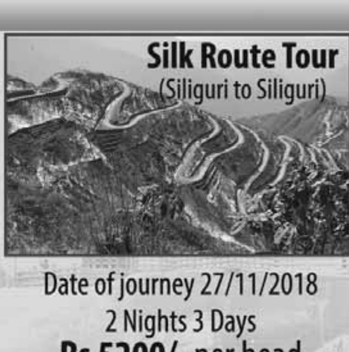

Date of journey 27/11/2018
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Andamans Package Tour
(Port Blair to Port blair)

Date of journey 22/12/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

Kerala with Kanyakumari
(NJP to NJP)

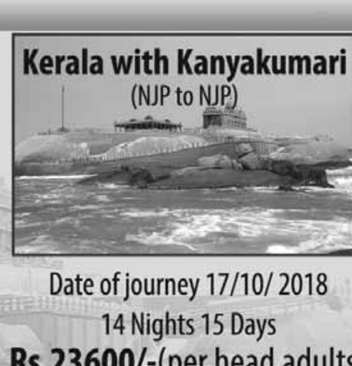

Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLiDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

পাহাড় প্রমাণ প্রেশার কুকার

পাহাড়ে শেরপার অভিশাপ ফলবে না, তা কি হয়? ফলে সেটাই হলো। খিচুড়ির থালার একদিকে মানুষ আরেক দিকে কুকুর। দু-জনেই বিষণ্ণ। খিচুড়িটা কারোরই রুচি সম্মত হয় নি। দিনভর হাজারো জোঁকের দংশনের পর এই 'জোক' কি ভাল লাগে রে ভাই! চোখে যা পড়েছে তা তো হলিউডের মুভি, কিন্তু পেটে পড়বে কী? আসলে, এই পর্ব হল এক ট্রেকিং-এর কাহিনি। তেনজিং নোরগের জুনিয়ার সংস্করণেরা সেবার ট্রেকিং-এ গিয়েছিল সান্দাকফু! গরমে ঠান্ডা পাহাড়ের গপ্পো, থুড়ি আখ্যান।

কথায় বলে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ভর দুপুরের হাড় কাঁপানো শীতে, সে কথাটা এক্কেবারে হাড়ে হাড়ে মালুম হল আমাদের। পেটে খিদে, সামনে আহার। অথচ, তা মুখে তোলার কথা ভাবলেই সবার অন্তর শিহরিত হচ্ছে। আপত্তির আঁচড়ে চিড়বিড় করে উঠছে পা থেকে মাথা।

অথচ মুখে কিচ্ছু বলার উপায় নেই। ক্ষোভ আর খিদে, দুটোকেই একযোগে মুখ বুঁজে হজম করছি সবাই। কারণ দোষ দেবো কাকে? প্রচণ্ড নুনে পোড়া এই অখাদ্য খিচুড়িটা, আমরা দশ ভূতে মিলে যে একই সাথে নিজেরাই হাতে হাত লাগিয়ে রান্না করেছি! ফলতঃ, নিজের কফিনে নিজেই পেরেক ঠুকে এখন আমরা প্রত্যেকেই... যাকে বলে, ইকুয়্যালি স্তম্ভিত!

পেটে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, আর বাইরেটা ভিজছে অবিশ্রাম বৃষ্টিতে। বন্যার তোড়ের মতো পাহাড় থেকে নেমে আসছে সুঁচ ফোটানো হাওয়া। সকাল থেকেই সূর্যের আলো প্রায় অদৃশ্য। কারণ চারিদিক থইথই করছে ঘন মেঘ আর বুনো কুয়াশায়। তার মধ্যে আবার, আমাদের জামাকাপড়, রুকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ... সব কিছুই আধ ভেজা ন্যাতানো পাঁপড়। নিরুপায় হয়ে অবশ্য সেগুলোই শেষ পর্যন্ত গায়ে জড়াতে হয়েছে। পাঁচ-ছয় ডিগ্রী ঠান্ডার চাবকানি তাতে যেটুকু সামাল দেয়া যায়, আর কি। সেই অবস্থায়, যে যার খিচুরির পাত্র সামনে নিয়ে, আপাততঃ আমরা একদম হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া টায়ারের মতো থেবড়ে পড়ে রয়েছি। বাকিম ফরেস্ট বাংলোর দোতলার ডরমেটরিতে। কারণ রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে। আর সে রেজাল্ট বলছে, প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে রাঁধা আজকের মধ্যাহ্নভোজ, একেবারে চূড়ান্ত ফ্লপ!

—শালা! একে কি বলে শেরপার অভিশাপ? এমন

অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গেল?

নিজ করুন কণ্ঠে, কিং সাইজ একখানা দীর্ঘশ্বাস মাখিয়ে কথাটা বলে উঠলো জয়। যে কি না, এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শায়িত রয়েছে, ঘরের দেয়াল ঘেঁষা একটি চৌকিতে। কাঠের সেই এক ফুট উঁচু চৌকিখানা, আকারে প্রকারে জয়ের দৈর্ঘ্যের মোটামুটি এইট্টি পারসেন্ট। ফলে, বেচারির পা আর মাথা, দুটোই চৌকির দু' ধার দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। এবং সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে শুয়ে, জয় তাকিয়ে আছে সামনে মেঝের দিকে। হাতের নাগালে যেখানে তার খিচুরির থালা। আর সে থালার উল্টোদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটি লোমশ ও দশাসই পাহাড়ি কুকুর, একদম মুখোমুখি। কুকুর আর মানুষ, উভয়ের চোখেই সমান হতাশা ও কাতরতা। কারণ খাবারটা কারোই জন্যই ঠিক রুচি সম্মত হয়নি।

—ইয়ে খানা তো কুত্তা ভিঁ নঁহি খাঁয়েগা...

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল বল্টুর নাটকীয় স্বরের মিমিক্রি। যেন 'শোলে' সিনেমার বলদেওঁ ঠাকুর, গব্বর সিং-কে হুমকি দিচ্ছে। কথাটা অবশ্য ওর নিজস্ব মতামত নয়। জয়, শেরপার যে অভিশাপের কথা এই মাত্র বলল, সেটাই হুবহু উদ্ধৃত করে বলা।

এই দোতলা কাঠের বাংলোর ঠিক উলটোদিকে একটি চালা ঘরে ট্রেকারদের রান্নার ব্যবস্থা। বাসনপত্র বলতে কুচকুচে কালো এক পেল্লায় কড়াই। আর সেইরকমই দৈত্যাকৃতি একটি তোবড়ানো ডেকচি। এছাড়াও সেখানে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাটির উনুন ও এক পাঁজা জ্বালানী কাঠ। কাল ইয়াকসুম থেকে আমরা ট্রেকিং শুরু করা ইস্তক সেই যে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, আজ সকালেও সেটি থামার কোনও লক্ষণ তো নেই-ই। বরং ঝড়ো বাতাসের আগমনে আরও তেড়েফুঁড়ে লন্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে। যার দাপটে আমাদের জোংরির দিকে ওপরের পথে ওঠার প্ল্যান পুরো পণ্ড। তাই স্টকের চালডাল দিয়ে খিচুড়ি পাকানোটাই এই অবস্থায় শ্রেয় মনে হয়েছিল। 'খাও দাও আর ঘরে বসে ভুতের গল্প শোনো' টাইপ আবহাওয়ায়, আমাদের পুরো টিম সেই উদ্দেশ্যেই রান্নাঘরে এসে হাজির। প্রথমে অবশ্য ধোঁয়ার ঠেলায় খুব এক চোট জেরবার হতে হল উনুনটা জ্বালতে। কিন্তু একবার সেই অসাধ্য সাধন সম্পন্ন হতে সবার আনন্দ দেখে কে! ডাইরেক্ট বিজয় উৎসব! রান্না শুরুর আগে থেকেই, প্রাণ ভরে পান শুরু।

কেউ একজন তখন একবার বলেছিল, 'দেখিস, তালেগোলে খিচুরিতে নুন দিতে ভুলিস না যেন!'

কী কুক্ষণে যে কথাটা বলেছিল! কারণ আবগারি ওয়েদারে অ্যালকোহল সিক্ত হয়ে আর বাকি বিশ্বসংসার ভুলে গুলে খেলেও, নুন দেয়ার কথাটা আমাদের দলের প্রত্যেক সদস্যই সযত্নে মনে রেখেছিল। এবং একে অন্যের অগোচরে, প্রত্যেকেই সে দ্বায়িত্ব পালাক্রমে পালনও করেছিল। ফলে, খিচুড়ির একদম যথার্থ 'দশচক্রে ভগবান ভূত' দশা!

ওই বৃষ্টি আর ঠান্ডায় একজন শেরপা নীচ থেকে ওপরে যাওয়ার পথে খানিকক্ষণের জন্য এসে, রান্নাঘরে আমাদের মাঝে বসে। একটু জিরিয়ে নিতে আর উনুনের তাপে একটু গরম হয়ে নিতে। তখন খিচুরি প্রায় হয়ে এসেছে। উষ্ণ পানীয়ের প্রভাবে আমরাও অতি অতিথি বৎসল। তাই, তাকে খিচুরি অফার করা হল। একগাল হেসে অফারটি সে গ্রহণও করল। কিন্তু খিচুড়ির এক গ্রাস মুখে তুলতেই তার চাঁদপনা মুখচ্ছবিতে জাস্ট পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ!

যথেষ্ট সহবত জানে বলে, 'ওয়াক' না তুলে কোনওমতে সেই গরাসটা গিলল সে। তারপর থালা নামিয়ে রেখে ভাবলেশহীন স্বরে করল সেই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী... ইয়ে খানা তো কুত্তা ভিঁ নঁহি খাঁয়েগা...!

কয়েক ঘণ্টা বাদে এখন দেখা যাচ্ছে অবিকল মিলে গেছে তার সেই কথা। কারণ আমরা সবাই মিলে শত সাধাসাধি স্বত্ত্বেও কুকুরটা কিন্তু একটি দানা খিচুড়িও মুখে তোলেনি। বরং বেশ কয়েকবার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে নাক বাড়িয়ে জিনিসটা স্রেফ শুঁকে দেখেছে, বম্ব স্কোয়াডের স্নিফার ডগ-দের মতো। তারপর একসময় লেজ গুটিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে থালার সামনে। অবোধ প্রাণী তো। ওর মনে তাই হয়ত একটা আশা রয়েছে যে খানিকটা সময় গেলে হয়ত কোনও ম্যাজিকে খিচুরিটা খাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে!

—পারছি না! আর পারছি না!

আমাদের ট্রেকিং টিমের আর এক সদস্য সায়ন দাস, হাউ হাউ করে উঠল।

—এই অবধি আসতে... এমনিতেই পথে জোঁকগুলো কয়েক গ্যালন রক্ত কমিয়ে দিয়েছে শরীর থেকে। তার ওপরে আবার এই উপোষ...। ঘরের ছেলে বেঁচে ঘরে ফিরতে পারবো তো রে?

জয় তাকিয়ে আছে সামনে মেঝের দিকে। হাতের নাগালে যেখানে তার খিচুরির থালা। আর সে থালার উল্টোদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটি লোমশ ও দশাসই পাহাড়ি কুকুর, একদম মুখোমুখি। কুকুর আর মানুষ, উভয়ের চোখেই সমান হতাশা ও কাতরতা। কারণ খাবারটা কারোই জন্যই ঠিক রুচি সম্মত হয়নি।

—যা বলেছিস!

আমি ওর সাথে কিছুটা সহমত হয়ে বললাম, জোংরি ট্রেকিং-টা সত্যি দেখছি... খুবই টাফ। সন্দক ফু তো এর কাছে বাচ্চার হাতের মোয়া বলতে হবে!

—হাতের মোয়া না হাতি! ...ঘরের আরেক প্রান্তের অন্ধকার থেকে কে যেন খেঁকিয়ে উঠলো, পড়তিস এমন বৃষ্টির পাল্লায় সান্দাক ফু-র পথে... তখন দেখতিস এই একই রকম নাকানি চোবানি খেতে হত!

কথাটার মধ্যে ঝাঁঝ থাকার অবশ্য কারণ আছে। সন্দক ফু আমাদের দলের প্রথম ট্রেকিং অভিজ্ঞতা। যা ছিল একেবারে মোলায়েম আর মসৃণ। কিন্তু পাহাড়ে, প্রকৃতির যে একটা ভীষণ অন্য রূপও থাকতে পারে, আমরা আনকোরা শখের ট্রেকার দল কি করে আর জানব? আদতে সবাই আমরা ডুয়ার্স-এর সমতল এলাকার ছেলে। একদমই সমতল অঞ্চল... জলপাইগুড়ি শহর। যেখানে নিদেন পক্ষে মালবাজার, চালসার মতো টিলা পাহাড়ও নেই আশেপাশে কোথাও। তবে হ্যাঁ, পরিষ্কার আবহাওয়ায় তিস্তার স্পার থেকে ভুটান পাহাড় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দিব্যি দেখা যায় বছরে বেশ কয়েক মাস। সেই একই পাহাড়কে স্পষ্ট দেখা যায় আনন্দচন্দ্র কলেজের জিমনেশিয়ামের বারান্দা আর মাঠ থেকেও। আর আমাদের বন্ধুদের দলটি, যেখানে এ-সি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিকের স্টুডেন্ট মিলে মিশে রয়েছে, রোজকার আড্ডা জমাতে পছন্দ করে হয় এই তিস্তা পাড়ে, নয়তো কলেজ পাড়ায়।

বলতে গেলে আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তরেখার কাছে ওই পিকচার পোস্টকার্ড দৃশ্য দেখেই আমাদের অনেকেরই পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণের শুরু। এরপর একটু একটু করে টিউশনি পড়িয়ে পাওয়া টাকা বা বাড়ি থেকে পাওয়া হাত খরচের টাকা জমিয়ে, একবার সবাই মিলে চলে গেলাম দার্জিলিং। আর সেখানে, দার্জিলিং ইউথ হস্টেলের ওয়ার্ডেন ক্যাপ্টেন মোক্তান, মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন অ্যাডভেঞ্চার ট্রেকিং-এর ছটফটে পোকাটি। তার ভোক্যাল টনিক এমনই কার্যকরী, যে দার্জিলিং থেকেই রুকস্যাক আর স্লিপিং ব্যাগ ভাড়া করে আমরা সটান সন্দক-ফু রওয়ানা হয়ে পড়লাম। আর তাতে, এক ধাক্কায় এমন এক জগত দর্শন হয়ে গেল, যার প্রতিটি ফ্রেম যেন হলিউড মুভি থেকে নেওয়া। কিংবা, নিদেনপক্ষে হার্জ-এর 'টিনটিন ইন টিবেট'! গল্পে বা সিনেমায় যে সুন্দরের কথা জেনেছি, তা যে হাতের এত কাছে জ্বলজ্যান্ত বর্তমান, তা এর আগে আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। ছাতু গোলা আর খিচুরির ওপর নির্ভর করে প্রথমবার সন্দক ফু পৌঁছে এরপর সবাই আমরা নিজেকে এক এক জন তেনজিং নোরগে ঠাওরাতে লাগলাম। মনে তখন অপার আত্মবিশ্বাস। সন্দক ফু যখন এত সহজে পেরেছি, এরপর কাঞ্চনজঙ্ঘা বা এভারেস্ট অভিযান কে রোখে!

সেই অত্যুৎসাহের ফসল হল আমাদের এবারের জোংরি ট্রেক। কিন্তু প্রসন্নময়ী প্রকৃতিরও যে একখানা রুদ্ররূপ আছে এবারে সেটা মোক্ষমভাবে মালুম হল। যাত্রা শুরু থেকেই তাই, কেবলই স্বপ্নভঙ্গ! হড়হড়ে কাদাতে পিছল রাস্তা, নাছোড়বান্দা বৃষ্টিতে ঝাপসা বাতাস আর পিণ্ড পিণ্ড রক্তলোলুপ জোঁকে টইটম্বুর গাছপালা, ঝোপঝাড়। এই সবে ভারাক্রান্ত আমাদের প্রতি পদক্ষেপ। সব মিলে এক ভয়ানক ডিপ্রেসিভ ধরনের অভিজ্ঞতা। সন্দক ফু-র বেলায় মানেভঞ্জন থেকে প্রথম পাহাড়টায় উঠতেই চারপাশের উন্মুক্ত উপত্যকার মায়াবী ছবি মনে এক রাজকীয় পরিতোষ জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এখানে, ইয়াকসুম থেকে বেরিয়ে সেই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গুলে সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটছি, তাতে খাটুনি আর হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি বলতে কিচ্ছু নেই। একটি পাহাড়ি নদীর একঘেয়ে ঝরঝর শব্দ, যাত্রাপথে আমাদের সারাক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু চোখের আরাম যোগাতে সে নদী যে একটিবার দেখা দেবে, জঙ্গলের ঘেরাটোপে সে উপায়টুকুও নেই। কেবলই মনে হচ্ছে আমরা যেন প্রাচীন কালের রোমান জাহাজের পাটাতনের নীচের ক্রীতদাস দল। খালি অন্ধকারে বসে ছপ ছপ করে দাঁড় টেনে যাচ্ছি। কিন্তু যাচ্ছি কোথায়, তার কোনও হদিশ নেই!

এই পথের আরেক জ্বালা হল ইয়াক কনভয়। দামী বিলিতি টুরিস্টদের তাঁবু, খাবারদাবার এবং এমনকি গ্যাস সিলিন্ডার পর্যন্ত ইয়াকের পিঠে চেপে ওপরে যাচ্ছে। আর সেই লোমশ ইয়াকগুলোর লং মার্চ, রাস্তার কাদাকে এমন ময়দা মাখা করছে, যে তাতে পা দিয়ে হাঁটা এক দুরূহ ব্যালেন্সের খেলা। তার ওপর আবার মাঝে মধ্যে ইয়াকদের রাস্তা ছাড়তে সরু গিরিপথের দেয়ালে ঠেসে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি। আর সেই সুযোগে, জংলি জোঁকের পাল হইহই করে ছেয়ে যাচ্ছে জামা কাপড়ে। একটা দুটো হলে সে জোঁক তবু ছাড়ানো যায়। কিন্তু এখানে এত তাদের সংখ্যাধিক্য যে নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হল। মনে মনে ধরে নিলাম যে এমন কোনও দেশে এসে পড়েছি, যেখানে দিনে দুপুরে

ড্রাকুলার উৎপাত। অতএব ক্ষণে ক্ষণে রক্তদান নিতান্তই বাধ্যতামূলক।

হরিবল ভাবে এমনই হড়কে হড়কে বিকেল তিনটে অবধি বৃষ্টির মধ্যে চলল যুদ্ধ। যার জেরে সবাই একেবারে কাকভেজা। একে তো প্যান্ট আর জুতো কাদা মেখে ডবল ভারী। এদিকে আবার পরিশ্রমের ঠেলায় শরীরও পাথরের মতো ভারী। সে অবস্থায় কোনওমতে কাদা ঠেলে ঠেলে মাতালের মতো হাঁটছি। আর, প্রতি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছে, এটাই শেষ স্টেপ। এবার মাটিতে বসে পড়লাম বলে! আজ রাতে ভালুকের পেটে যাওয়া কে ঠেকায়!

একটা বাঁক ঘুরে তখন, সামনেই বাকিম গ্রামটি দেখা দিল। গ্রামের প্রথম কাঠের বাড়ি থেকে ঢাল বেয়ে বড় জোর পঞ্চাশ মিটার দূরে দেখা যাচ্ছে ফরেস্ট বাংলো। পাহাড়ের গা কেটে তৈরি এক টুকরো সমতল জমির ওপর কুচকুচে কালো কাঠের একটি দোতলা বাড়ি। কিন্তু সেই অবধি যাওয়ার পথটাকে পথ বলা যায় না। রীতিমত একটা কাদার নালা। মাতালদের মতো হামাগুড়ি দেয়ার এক অদম্য ইচ্ছেতে তখন চেতনা আচ্ছন্ন। কিন্তু ইচ্ছাপূরণে বাধা সেই কাদা! তাই কাদাকে গাল পাড়তে পাড়তে গ্রামের বাড়িগুলোর কাঠের বেড়ার ধার আঁকড়ে ধরতে হল। অতঃপর জোঁকদের সাথে 'হোক আলিঙ্গন' করে ঝুলতে ঝুলতে কোনওমতে বাংলো অবধি একে একে এসে উপস্থিত হলাম সবাই। তবে এবারে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে, যে আর হাঁটতে হবে না, আর ভিজতে হবে না! বরং, রাতে পানীয়ের সঙ্গে মুখরোচক খাবার জুটবে এবারে। খাওয়ার কষ্ট এড়াতে, এই যাত্রায় একখানা আস্ত প্রেশার কুকার এবং চালডাল সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে এসেছি আমরা! সন্দক ফু-র মতো বেলায় বেলায় জলে গোলা ছাতু খেয়ে অন্ততঃ প্রাণ ধারণ করতে হবে না।

তাহলে এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে রাতের খাওয়ার বেলায় যদি প্রেশার কুকারের বন্দোবস্ত থাকে, তবে পরদিন দুপুরে কড়াই কাণ্ড কেন?

তা, সেই প্রশ্নেরও যুক্তিসংগত জবাব আছে বইকি! দলে রয়েছি আমরা জনাদশেক জোয়ান যুবক। একটা প্রেশার কুকারের ক্যাপাসিটি অন্ততঃ চারবার ছাপিয়ে যাবে যদি আমাদের সে রাতের সমবেত খিদেকে ঠিকঠাক মাপজোক করা যায়। একদম নিরপেক্ষ বিচারে আমি অন্ততঃ বলব যে, ওই রাতে এক প্রেশার কুকার খিচুড়ি, জয়ের একারই খোরাক হতে পারতো। পৃথিবী উল্টে যেতে পারে, কিন্তু রাতভর পেটে কিল মেরে বসে থাকার বান্দা সে নয়। সারাদিনের ধকল শেষে আর কারোর যখন কুটোটি নাড়ার ক্ষমতা নেই, জয় কিন্তু একাই উদ্যোগ নিয়ে চাল, ডাল, প্রেশার কুকার এবং টর্চ নিয়ে আবার সেই কাদার নালা পার করেছিল। বাংলোর ঘুটঘুটে অন্ধকার কিচেনটি ব্যবহারযোগ্য নয় দেখে, সে নীচে চলে গিয়েছিল, একদম বাংলোর চৌকিদারের বাড়ি। সেখানে, তার বৃদ্ধা স্ত্রী-কে ভজিয়ে তাদেরই উনুনে খিচুড়ি রান্না করে সেই খাদ্য নিয়ে আবার সে ফিরে আসে আমাদের নির্জীব রেজিমেন্টের কাছে। একদম সত্যিকারের লিডারের মতো কাজ। একার উদ্যোগেই সে রাতে অন্ততঃ কয়েক গ্রাস করে খাবার সবার মুখেই সে তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু পরদিন সকালে আর সেরকম কম্প্রোমাইজ করার প্রশ্ন নেই। রাতে না হয় আলোর অভাবে রান্নাঘরটা কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু দিনের বেলায় তো সেই প্রবলেম সলভড! আর তা ছাড়া, খিদে তখন একেবারে লাগামছাড়া। ওইটুকু প্রেশার কুকারের ভরসায় আর থাকা যায় না। ফলে, এক পেট করে খিচুড়ি সাঁটাবার বাঞ্ছা নিয়েই তখন তাই কালো কড়াইয়ের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয়...! শেষে কোলরিজ-এর 'এন্সিয়েন্ট মেরিন্যার' কবিতার নাবিকটির মতো দশা হল আমাদের... 'ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার...নট আ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক...'।

হলফ করে বলতে পারি, সে দুপুরের খিচুড়িটা সমুদ্রের জলের চেয়েও বেশি নোনা ছিল!

খিদের সাথে যুদ্ধের আরও কিছু মর্মান্তিক এপিসোড আছে আমাদের সেবারের জোংরি ট্রেক-এর অভিজ্ঞতায়। কিন্তু সে গল্প আরেকদিন। আজ, প্রেশার কুকার পর্বটাই পুরোপুরি বলে শেষ করি। এই জিনিষটির মালিক ছিল হিটু। যদিও ট্রেকিং-এ বহন করার পক্ষে জিনিসটা যথেষ্ট ভারি... জয় কিন্তু সাগ্রহে ওটাকে ওয়েলকাম জানিয়েছিল সেবারের ট্রিপে। ভাল খাদ্যের একাগ্র ভক্ত সে, আগেই বলেছি। অতি ভারি প্রেশার কুকারের রুকস্যাকটি আমরা কেউই মিনিট দশেকের বেশি টানতে পারিনি সারা রাস্তায়। জয় তখন অবলীলাক্রমে এইট্টি পারসেন্ট রাস্তা নিজেই ঘাড়ে করে সেই জিনিসকে বাকিম অবধি তুলে নিয়ে এসেছিল।

পাহাড়ের গা কেটে তৈরি এক টুকরো সমতল জমির ওপর কুচকুচে কালো কাঠের একটি দোতলা বাড়ি। কিন্তু সেই অবধি যাওয়ার পথটাকে পথ বলা যায় না। রীতিমত একটা কাদার নালা। মাতালদের মতো হামাগুড়ি দেয়ার এক অদম্য ইচ্ছেতে তখন চেতনা আচ্ছন্ন। কিন্তু ইচ্ছাপূরণে বাধা সেই কাদা! তাই কাদাকে গাল পাড়তে পাড়তে গ্রামের বাড়িগুলোর কাঠের বেড়ার ধার আঁকড়ে ধরতে হল। অতঃপর জোঁকদের সাথে 'হোক আলিঙ্গন' করে ঝুলতে ঝুলতে কোনওমতে বাংলো অবধি একে একে এসে উপস্থিত হলাম সবাই।

কিন্তু বাকিম পর্বের পরে আমাদের দল দুই ভাগে ভেঙে গেল। জয়-সহ আমরা পাঁচজন চললাম জোংরির দিকে। আর বাকি ছয়জন সে ধকল নিতে না চেয়ে, ইয়াকসুমে নেমে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল। প্রেশার কুকার নিয়ে একটা সঙ্কট দেখা দিল তখন। ওপরে ওঠার রাস্তা আরও বিপদসঙ্কুল ও কঠিন শুনে আমরা প্রেশার কুকার বহনের ইচ্ছে ত্যাগ করলাম। কিন্তু ইয়াকসুমগামী দলে জয়ের সমকক্ষ কেউ নেই যে ওটাকে ঘাড়ে করে সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবে। অবস্থা প্রায় এমন দাঁড়াল যে প্রেশার কুকারটা তাহলে নিচের খাদে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়!

সায়ন বলল, টিপ করে নদীতে ছুঁড়তে পারিস কি না, দ্যাখ হিটু, ট্রাই করে। আমরা নীচে পৌঁছতে পৌঁছতে ওটাও হয়তো জলে ভেসে ভেসে ইয়াকসুম পৌঁছে যাবে!

সেই সময় হঠাৎ লাজুক লাজুক মুখে বাংলোর চৌকিদারের আগমন। হিন্দি ও সিকিমিজ ভাষার দুর্বোধ্য মিশ্রণে সে কিছু একটা বলতে চাইল। ছোটবেলায় বেশ কিছুদিন কার্সিয়াং-এ কাটানোর ফলে আমাদের মধ্যে বল্টুই হল পাহাড়ি ভাষার একমাত্র অথেনটিক এক্সপার্ট। ভাল করে সব শুনে সে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে আমাদের উদ্দেশে জানালো... চৌকিদারটা বলছে, ওর বৌ প্রেমে পড়েছে...

আমাদের সবার চোখ সটাসট ঘুরে গেল জয়ের দিকে। প্রেশার কুকার বগলে করে খিচুড়ি রাঁধতে সে রাতে জয়-ই গিয়েছিল চৌকিদারের বাড়ি। আমাদের সবার নীরব দৃষ্টিতে তাই একটাই প্রশ্ন... চৌকিদারের বৌ-এর পাশে বসে খালি কি খিচুড়িই রান্না করেছিস তুই? নাকি...?

জয় অত্যন্ত অস্বস্তির সাথে বলল, আরে... কি হচ্ছে কি? এ তো দেখছি যত দোষ নন্দ ঘোষ...

বল্টু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, না না এতে তোর কোনও ইনভলভমেন্ট নেই ভাই। মহিলা আসলে... হিটুর প্রেশার কুকারের প্রেমে পড়েছে!

ব্যাস! ওখানেই তখনকার মতো মধুরেণ সমাপায়েৎ। কয়েকশো টাকার বিনিময়ে প্রেশার কুকারটা বিক্রি করে দিয়ে হাসি মুখে দায়মুক্ত হয়ে আমরা সবাই যে যার পথ ধরলাম! যারা ইয়াকসুম চলে গেল, তাদের তো ল্যাটাই চুকে গেল। কিঞ্চিত ঝামেলা কপালে রয়ে গেল আমাদের জোংরি-গামী টিমের কপালে। কারণ জোংরি থেকে ফেরার পথে, চৌকিদার দম্পতি প্রেশার কুকার সহ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বাকিমে। কেন...? সেটা না হয় পরের বারে শোনাবো!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

অবলুপ্তির পথে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকক্রীড়া ?

(গত সংখ্যার পর)

ষোলাপাইতা

রামায়ণের মন্দোদরী দাবা খেলার স্রষ্টা। সেই দাবা খেলার অনুকরণে রাজবংশী লোকসমাজে প্রচলিত হয় কয়েকটি লোকক্রীড়া। সেগুলির মধ্যে একটি হল—'ষোলাপাইতা'। সাধারণত গ্রীষ্মকালে কর্ম থেকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে গাছের তলায় যুবক-কিশোরগণ বা বয়স্করা খেলাটি খেলে থাকে। এই খেলাটি কোনও কোনও স্থানে 'ষোলোগুটি' নামেও পরিচিত। দুইজন মিলে খেলাটি খেলতে হয়, তবে খেলোয়াড়দের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে অন্যরা সাহায্য করতে পারে। এটি মূলত বুদ্ধির খেলা। দুইজন খেলোয়াড়ের হাতে ষোলটি করে কড়ি বা গুটি (ছোট নুড়ি-পাথর, লাউ-কুমড়ো-তেঁতুল বীজ) থাকবে। প্রতিপক্ষের গুটি আলাদা হয়। নির্দিষ্ট ছকে, নিজের ঘরে খেলোয়াড়রা গুটি বসায়। তিনটি কড়ি একই লাইনে সন্নিবিষ্ট করতে পারলেই 'পাইত' হয়। কোর্টের কোনও স্থান থেকে বিপক্ষের সব গুটি খেতে পারলেই জয়ী হওয়া যায়। এই খেলাটি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। একই নিয়মের আরেকটি খেলা কোচবিহার জেলায় প্রচলিত, খেলাটির নাম 'মোঘল-পাঠান'।

বারোপাইতা

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িসহ অন্যান্য জেলায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খেলা 'বারোপাইতা'। এটি ষোলোপাইতার অনুরূপ খেলা। দুই জনের খেলা তবে অন্যান্যরা সহযোগিতা করতে পারে। নির্দিষ্ট ছকে দুইজন খেলোয়াড়ই পরপর একটি করে গুটি বা কড়ি বসায়। এখানেও একই রেখায় পরপর তিনটি গুটি বসাতে পারলেই 'পাইত' হয়। কেউ পাইত করতে পারলে অপর পক্ষের একটি কড়ি ইচ্ছা মতো তুলে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত যে খেলোয়াড়ের দুটি কড়ি অবশিষ্ট থাকে সেই হেরে যায়। বুদ্ধির প্রয়োগ করতে না পারলে এই খেলায় জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

ঘুরানি

এই খেলাটি রাজবংশী সমাজের একটি লুপ্তপ্রায় খেলা। দুইজন প্রতিপক্ষ হিসাবে খেলাটি খেলে এবং তাদের খেলার গুটি বা কড়িগুলি আলাদা রকমের হয়, যাতে প্রতিপক্ষকে সহজে চেনা যায়। মোট গুটি বা কড়ির সংখ্যা ১২ + ১২ = ২৪টি। কড়ি খাওয়া যায় তখনই, যখন বিপক্ষের একটি কড়ির পরবর্তী ঘর সমরেখায় ফাঁকা থাকে। অর্থাৎ একপক্ষ অপর পক্ষের গুটি ডিঙিয়ে বা টপকে খায়। একে অপরের গুটি খেয়ে উঠিয়ে রাখে। যার গুটি শেষ হয়ে যায়, সেই পরাজিত হয়। এটিও বুদ্ধির খেলা।

ছামখোটলই

'ছামখোটলই' খেলাটির নিয়ম হুবহু ঘুরানি খেলার মতো। তবে এই খেলায় গুটির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। দুজন খেলোয়াড়ের মোট গুটির সংখ্যা ৯ + ৯ = ১৮টি। একপক্ষ অপর পক্ষের সবগুটি খেয়ে শেষ করতে পারলেই জয়ী হয়।

চক্করচাল

ঘুরানি খেলার মতোই আরেকটি খেলা 'চক্কর চাল'। দুইজন প্রতিপক্ষই জয়লাভের জন্য বুদ্ধির লড়াই করে থাকে। প্রত্যেক পক্ষের ২৪টি করে মোট ৪৮টি কড়ির প্রয়োজন হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের সব গুটি খেলেই খেলা শেষ হয়। গুটি বা কড়ি খাওয়ার নিয়ম 'ঘুরানি' খেলার মতই।

আটঘরিয়া

এই খেলাতেও 'ঘুরানি' খেলার মতো প্রতিপক্ষের গুটি বা কড়ি আলাদা হয়। মূল ছকের বাইরে অতিরিক্ত আটটি ঘর থাকার জন্য খেলাটির নাম 'আটঘরিয়া'। সাধারণত নুড়ি-পাথর, তেঁতুল বীজ, পাটকাঠি বা কচুর ডগাকে কড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিপক্ষের ৩৪টি করে মোট ৬৮টি কড়ির প্রয়োজন হয়। প্রথম চালের পর প্রতিপক্ষ বুদ্ধি খাটিয়ে এমন চাল দেয় যাতে বিরোধী পক্ষের একাধিক গুটি খাওয়া যায়। এখানেও অপর পক্ষের গুটি ডিঙিয়ে বা টপকে খেতে হয়। খেলার নিয়ম অনুযায়ী হাতের কড়ি শেষ হওয়া পর্যন্ত কড়ি বসিয়ে যেতে হবে। রাজবংশী জাতির যুবকরাই অবসর বিনোদনের জন্য খেলাটি খেলে থাকে।

বাঘ-ছাগল

খেলাটি দুই জনে খেলতে হয়। একজন বাঘ আর অপর জন ছাগল। তবে মোট ছাগল সংখ্যা তিনটি। বাঘের হাতে এক হাত লম্বা বিশিষ্ট পাটকাঠি থাকে। ছাগলগুলিকে পাটকাঠির ছোট অংশ বা নুড়ি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম চাল ছাগলকে দিতে হয়। ছাগল চালের মাধ্যমে বাঘকে বন্দি বা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু বাঘ ছাগলগুলোকে খাওয়ার চেষ্টা করে। খেলায় বাঘ ও ছাগলের মধ্যে কে জিতবে তা নির্ভর করে খেলোয়াড়ের উপস্থিত বুদ্ধি বা আক্রমনাত্মক কৌশলের উপর। স্থানভেদে খেলাটির ভিন্নরূপ পাওয়া যায়, যেখানে বাঘের সংখ্যা দুইটি আবার ছাগল সংখ্যা ষোলটি হয়। খেলাটির দ্বারা খেলোয়াড়ের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুকটি মুঞ্জা

রাজবংশী লোকসমাজে প্রচলিত অপর একটি বুদ্ধিমত্তা ও বিনোদনমূলক খেলা 'পুকটি মুঞ্জা'। এটিও দুজনের খেলা। কড়ির সংখ্যা ২ + ২ = ৪টি। দুইজন খেলোয়াড়ের কড়ি আলাদা আলাদা হয়। কড়ি বা গুটি হিসাবে নুড়ি পাথর বা পাটকাঠির ছোট টুকরো ব্যবহার করা হয়। এটিও বুদ্ধিমত্তার খেলা।

সাত ঘরের পক্তা

রাজবংশী লোকক্রীড়ার অন্তর্গত 'সাত ঘরের পক্তা' খেলাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই খেলায় পাশাপাশি দুটি লাইন সাতটি (৭টি) করে চোদ্দটি ছোট গর্ত করতে হয়। প্রতিটি গর্তে ৪টি করে মোট ৫৬টি কড়ি বা ছোট পাথর রাখতে হয়। এটি দুই জনের খেলা। প্রথম খেলোয়াড় নিজের লাইনের একটি গত থেকে চারটি কড়ি তুলে নিয়ে পরবর্তী ঘরে রাখে। তারপর পরবর্তী ঘর থেকে চারটি পাথর নিয়ে তার পরবর্তী ঘরে রাখে। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে। এভাবে চালতে গিয়ে যদি দেখা যায় পাথর রাখা ঘরের পূর্ববর্তী ঘরটি ফাঁকা, তাহলে ফাঁকা ঘরের পরবর্তী ঘরের কড়িগুলি তুলে রাখে। অর্থাৎ পাথরগুলি সেই খেলোয়াড়ের হয়ে যায়। কিন্তু হাতের পাথর শেষ হওয়ার পরে যদি দুটি ঘর ফাঁকা থাকে তাহলে ওই খেলোয়াড় 'পচ্‌কাটিয়া' হয়। তখন অপর খেলোয়াড় একই নিয়মে খেলাটি খেলে। প্রথমবারের চালে যতগুলি কড়ি জমা হয়, সেগুলোকে চার দিয়ে ভাগ করার পরে অবশিষ্ট একটি কড়ি থাকলে তাকে 'কোটন', দুইটি থাকলে 'ধুদি' ও তিনটি থাকলে 'তেন্দা' বলে। দ্বিতীয় চালে অবশিষ্ট 'কোটন', 'ধুদি' ও 'তেন্দা' কড়িগুলি রেখে বাকি কড়িগুলি দিয়ে চাল দেয়। এই খেলার আর একটি নিয়ম হল, অপর পক্ষের চাল দেওয়ার সময় যদি ১, ২ বা ৩টি গুটি থাকে তাহলে সেগুলো তুলে নিতে হয়। এভাবে খেলার শেষে দেখা যায় সব কড়ি দুইজনের হাতে চলে যায়। যার কড়ির সংখ্যা বেশি হয়, সেই জয়ী হয়। তবে এই খেলার আরও বিস্তাড়িত নিয়ম স্থানভেদে প্রচলিত।

আড়ির বেটা

রাজবংশী লোক সমাজে প্রচলিত একটি ব্যতিক্রমী খেলা 'আড়ির বেটা'। জনশ্রুতি অনুযায়ী আড়ির বেটাকে কেউ খেলার সঙ্গী না করায় সে মাটিতে দাগ কেটে একটি খেলা আবিষ্কার করে। এই খেলাটি 'আড়ির বেটা' নামে পরিচিত হয়। খেলাটি একা একা খেলতে হয়। 'আড়ির বেটা' খেলার ছকটি কাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে এক টানে আঁকতে হয়। ছকটি তারা বা স্টার চিহ্নের মতো হয়। মোট কড়ির সংখ্যা নয়টি। যে কোনও ফাঁকা ঘর থেকে ১, ২, ৩ গুণে কড়ি বসাতে হয়, প্রতি তিন নম্বর ঘরে কড়ি বসে। কড়ি বসানোর কৌশলটি খুবই কঠিন। কড়ি হিসাবে নুড়ি-পাথর পাটকাঠির টুকরো ব্যবহার করা হয়। দুটি বিন্দুর মিলিত স্থানকে ঘর বলে। মোট ঘরের সংখ্যা নয়টি। নয়টি ঘরে নয়টি কড়ি বসানো হয়।

উল্লেখিত খেলাগুলি ছাড়াও আরও কিছু খেলা রাজবংশী লোকক্রীড়ায় প্রচলিত। সেই খেলাগুলি হল—ভাত-শাক বাসুদিয়া, ধাপ্পই/শিলটুক্কা (পাঁচটি ছোট পাথরের দ্বারা), চৌপাইতা, কানা-পাইতা, মার্বেল/গুলি ইত্যাদি। এখানে রাজবংশী লোকক্রীড়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেলেও বিস্তারিত আলোচনার অভাব থেকেই গেল।

কোকিল চন্দ্র রায়

আগামী সংখ্যায়

হতাশ করল? নাকি ব্যালটে জবাব দিল?

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের পটভূমিতে মেটেলি ব্লকের চা বাগিচার সুলুক-সন্ধান। এবার চা বলয়ের ভোটের ফল কিন্তু যথেষ্ট অপ্রত্যাশিত, শাসকের পক্ষে সুখকর নয় মোটেই, বরঞ্চ বলা যায় রাজ্য জুড়ে একশ শতাংশ আধিপত্য বিস্তারের 'নীতি'তে বাকিরা হাওয়া হয়ে গেলেও একমাত্র বদলের ইঙ্গিত দিয়েছে ডুয়ার্সের চা বলয়। সব মহলেই তাই প্রশ্ন উঠছে কেন এমনটি হল? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সবার আগে বোধহয় দেখে নেওয়া প্রয়োজন ঠিক কী অবস্থায় আছে নাগেশ্বরী বা সামসিং বা জুরান্তির মতো পরিকাঠামোহীন, বন্ধ বা দুর্বল অথবা অচল চা বাগানগুলি? কীভাবে আসছে তাদের দানাপানি? যে বাগানগুলি বন্ধ, অথবা যে বাগানগুলির অধিকাংশ গাছ এখন ঝোপঝাড়, বাকি সামান্য অংশে পুলিং হয়, অথবা নতুন পাতা গজায়, কারা করে সেই কাজ?

এর আগে বাগিচার ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম, গত এক দশকে বহু মানুষ যেমন মারা গেছে, তেমনি কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে একটা বিরাট অংশ। মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সংখ্যাটাও খুব একটা কম নয়। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ফ্যাক্টরি, পরিত্যক্ত শ্রমিক আবাসনগুলিও ভুতুড়ে বাড়ির আকার ধারণ করেছে বহু বাগানে। অথচ যেগুলিতে মানুষ রয়েছে তার সব কটিতেই ডিস অ্যান্টেনা সহ টিভি আছে। প্রতিটি শ্রমিক মহল্লাতেই আছে দোকানঘর, নানা ধরনের চাটসহ শুঁড়িখানা। বাগানে পড়ে থাকা চা-শ্রমিকেরাই চা গাছ পুলিং, চা পাতা তোলা, হাত মালাই ইত্যাদি কাজ করে থাকেন অভ্যাসবশে। ফাউলাই মিলছে অধিকাংশ বন্ধ বাগানে ১৫০০ টাকা করে। সরকারি রেশনে মিলছে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল এবং আটা। ১০০ দিনের কাজও মিলছে। পাশাপাশি আছে নদী থেকে বালি পাথর তোলার কাজ। ৮-১০ বছরের শিশু শ্রমিক থেকে বুড়ো শ্রমিক সবাই প্রায় সেই কাজে হাত লাগিয়ে পাচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। প্রায় সমস্ত শ্রমিকের ঘরে চলে এসেছে অন্ততপক্ষে দু-দুটি সাইকেল। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, তার জন্য নানা প্রকল্পের টাকা হাতে আসছে। এক কথায় কাঁচা টাকা কিন্তু বন্ধ-খোলা-অচল সব চা বাগানে পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত। তার মানে শ্রমিকেরা কি দিব্যি আছেন? তাহলে নির্বাচনের বাক্সে এই অসন্তোষের প্রতিফলন কেন?

একসময় কমিউনিস্ট পার্টির দুর্গ ছিল এই ব্লকের অন্তর্গত চা বাগিচাগুলি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মালবাজার এবং মেটেলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সে ভিত আজ আর নেই বলাই বাহুল্য। জাতপাত, সম্প্রদায়গত সংঘাতও নেই বললেই চলে। কিন্তু অবক্ষয়, চোখরাঙানি, বিরোধী দমননীতি শাসকশ্রেণির প্রাধান্যকে যে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। অথচ উন্নয়ন যে হয়েছে একথা বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারছে না। তাহলে এই মারধর, খুনখারাবি, দলাদলি, বলপ্রয়োগ করে মনোনয়ন জমা না দিতে দেওয়ার কারণটা কী ঘটল এটা বুঝে উঠতে পারছেন না মেটেলি, মালবাজার এবং সংলগ্ন

এলাকার মানুষ। কারণ শান্তিপূর্ণ ভোটদানেই অভ্যস্ত সবাই। ভোটের দিনগুলিতে থাকত উৎসবমুখর পরিবেশ। তাছাড়া সরকারি সুযোগসুবিধাও তো কম পাচ্ছে না গরীব মানুষজন। তাহলে কেন শাসন ক্ষমতা দখল করার এই ঘৃণ্য কৌশল? চা বলয়ের মানুষ এই বলপূর্ব্বক রাজনীতিকে কি ভাল চোখে নেয়নি? সত্যিই কি ডুয়ার্সের সবচেয়ে সংকটাপন্ন চা বাগিচা এলাকায় মজদুরদের ভাবনাচিন্তা কোন পথে প্রবাহিত হতে চলেছে তার খোঁজ করেছেন কেউ? পঞ্চায়েতের নির্বাচনী ফলাফল কিন্তু সেই প্রশ্নই তোলে।

নাগেশ্বরী চা বাগান

মালবাজার মহকুমার নাগেশ্বরী চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এর আগে বেশ কয়েকটি ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শাসকগোষ্ঠীর ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত। মোট চাষযোগ্য **উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৬২৯.৯২ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে ১৭৩৫ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। **মোট কর্মরত শ্রমিক ১০৯২ জন**। নাগেশ্বরী চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত চায়ের **মোট বিক্রির পরিমাণ ১০ থেকে ১২ লাখ কেজি**। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাগিচায় ইনঅরগানিক সিটিসি চা প্রস্তুত হয়। বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে উন্নতমানের হলেও পরিকাঠামোহীন হয়ে পড়ার ফলে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। ফলে মাঝেমধ্যেই মজুরি সংকটে বাগানটি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। এই বাগানটি ডান এবং বাম শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার চা শ্রমিকদের মজুরি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই অন্যান্য সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের মজুরির থেকেও কম। গত দেড়শ বছর ধরে ওদের মজুরি যা ছিল বা আজও যা আছে তা শুধু বাংলা নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতেও কমবেশি একই অবস্থা। তবে সুযোগসুবিধা প্রদানের প্রশ্নে বলা যায় বাংলায় শোষণের পরিমাণ বেশি। চা শিল্প যখন গড়ে উঠেছিল তখন ওদের কত মজুরি দেওয়া হত তা জানা যায় না। কোটি কোটি গাছ চাষ, গুল্মলতা, কাঁটার জঙ্গল, স্যাঁতসেঁতে ঘন অন্ধকারে আবৃত জঙ্গলে যে কঠিন কাজ শ্রমিকেরা করত তার মজুরি কত নির্ধারিত হয়েছিল তা জানা দুষ্কর। বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোনও মহিলা ও শিশু এই কাজে আসেনি। অভিজ্ঞতা

থেকে চা-করেরা আবিষ্কার করেছিল এই শিল্পে সমস্ত শ্রমিক পরিবারকে পরিবারভিত্তিকভাবে নিয়োগ করা যায় এবং কম পয়সা দিলেও চলে। পরীক্ষামূলকভাবে যখন চা শিল্পে মহিলাদের নিয়োগ করা হয় তখন জানা যায় মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের থেকেও ক্ষিপ্রগতিতে পাতা তুলতে পারে। সুতরাং মহিলা শ্রমিক নিয়োগ আবশ্যক হয়ে ওঠে। কিন্তু মহিলারা ভাল কাজের হলেও দীর্ঘ একশো বছর পুরুষের চেয়ে কম বেতন পেয়েছে। এরপর কিশোর-কিশোরী এবং বালক-বালিকাদের নিয়োগ করা হয়। শিশু শ্রমিকদের মজুরি ছিল আরও কম। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

অথচ চা শিল্পের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত চা-করেরা বলে আসছেন চা-শ্রমিকদের মাসিক আয় সবচেয়ে বেশি, এত সুবিধা আর কোনও শিল্পের নেই। কারণ ওদের মজুরি ছাড়াও বাড়তি কাজ করলে বেশি পয়সা। তাছাড়া ওদের বিনা পয়সায় থাকার ঘর দেওয়া হয়, জ্বালানি দেওয়া হয়, কোয়ার্টার সংলগ্ন জমিতে সবজি-ফল-গরু-মুরগি প্রতিপালন করে ওরা আরও আয় করে। অনেক সময় ওদের জমি দেওয়া হয়েছে ধান চাষের জন্য। তাছাড়া ওদের জন্য ছিল এবং আছে চিকিৎসা ও বিনা পয়সার ওষুধ। ওদের পরিবার সন্তান প্রসব করলে দেওয়া হত মেটারনিটি সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা। কিন্তু নাগেশ্বরী চা বাগিচায় সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রতি যদি এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায় তাহলেই শোষণের চিত্রটা চোখের সামনে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যেমন নাগেশ্বরী চা বাগিচায় হাসপাতাল বা আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা ওয়ার্ড-এর ব্যবস্থা আছে ঠিকই, কিন্তু গিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যখন কথা বললাম তখন জানলাম ওয়ার্ডের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে কোনও বেড নেই। মেটারনিটি ওয়ার্ড থাকলেও রোগীরা আসে না। তাদেরকে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালের একটিমাত্র অ্যাম্বুলেন্সের সামনের টায়ার পাংচার অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। কর্তব্যরত চৌকিদারের কাছ থেকে জানতে পারলাম স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ভয়ংকর খারাপ। বাইরে চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদের রেফার করে দেওয়া হয়, অথচ তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য কোনও অ্যাম্বুলেন্স অথবা বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। বাগিচায় ডাক্তার আছে ঠিকই, তবে কী চিকিৎসা পরিষেবা তিনি দেন তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। কারণ বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয় না বলে স্বাস্থ্যকর্মী নিজেই জানালেন। বাগিচায় প্রশিক্ষিত নার্স একজন মাত্র। কোনও মিডওয়াইভস চোখে পড়ল না। নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে মালিক তথা ম্যানেজমেন্টের প্রতি তাদের ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণার প্রতিফলন লক্ষ্য করলাম। সবারই কথা এক, ডানকানসের হাতেএই বাগানটির ভিত্তি স্থাপিত হলেও তাদের উত্তরসূরী গোয়েঙ্কারা একেবারেই ছিবড়ে করে দিয়েছে।

বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই দীর্ঘদিন থেকেই। ক্যান্টিন নেই। ভাঙ্গাচোরা বিধ্বস্ত ক্রেশের সামনে গিয়ে শিশুদের অসহায় চেহারাটা চোখের সামনেই ভাসছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকে না। শৌচাগার নেই। দুধ, বিস্কুট, পুষ্টিকর খাবার শিশুদের সরবরাহ করা হয় না, পোশাক দেওয়া হয় না। পানীয় জলের বন্দোবস্ত নেই। চারজন অ্যাটেনডেন্ট থাকলেও খুব স্বাভাবিক কারণেই বাগিচা শ্রমিকেরা তাদের

শিশুদেরকে না পাঠিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করে কাজে যান। বাগিচাসংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম মেটেলি হাই স্কুল। সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। তবে তা সচল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। মাঝেমধ্যেই বাগিচার একমাত্র বাসটি বিগড়ে থাকে। তখন শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিজেদের উদ্যোগেই যেতে হয়। তবে শ্রমিক পরিবারের সন্তান বাবলু হেমব্রম জানালো, যেহেতু মেটেলি হাই স্কুল খুব একটা বেশি দূরবর্তী নয়, তাই তারা সাইকেল নিয়েই যাতায়াত করে। বাগিচায় বিনোদনমূলক ক্লাব আছে, খেলার মাঠ আছে।

স্বাধীনতার পরেও চা বাগিচাগুলিতে শোষণের হার এতটাই তীব্র থাকবে একথা বোধহয় হতভাগ্য চা-শ্রমিকরা ভাবতেই পারেনি। ভাবতে পারেননি চা বাগিচা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা লালশুকড়া ওঁরাও প্রমুখ। একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায় ব্রিটিশ আমলে নানা অছিলায় শ্রমিকদের মজুরি কেটে নেওয়া হত। মজুরি পাওয়ার পর এক পয়সা করে সর্দারদের কমিশন দিতে হত। শ্রমিকেরা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হওয়ার ফলে মজুরি কম দিলেও ওরা ধরতে পারতো না। পাতা তোলার মরশুমে নির্দিষ্ট কোটার চেয়ে বেশি পাতা তুললে ওদের বেশি পয়সা দেওয়া হত। পাশাপাশি পাতা তোলার ওজন কম দেখিয়ে ওদের কম মজুরি প্রদান করে শোষণ অব্যাহত থাকত। এই চিত্রের সামান্যতম হেরফের হয়নি।

মেটেলি টি গার্ডেন

মালবাজার মহকুমার মেটেলি টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী লক্ষ্মী টি কোম্পানি লিমিটেড। বাগানটি ডিবিআইটিএ-এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ২০০১ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। হেড অফিস কলকাতায়। মোট **চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদিক্ষেত্র ৭০৮.০৯ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৯০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। **কর্মরত শ্রমিক ১৭৬৪ জন**। মেটেলি চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৫০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত **মোট বিক্রয়যোগ্য চা ১১ লাখ কেজি**। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ২-২.৫০ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে মোট ১৩-১৪ লাখ কেজি বিক্রয়যোগ্য চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে ইনঅরগানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা চরিত্রগত দিক

থেকে অত্যন্ত উন্নত মানের। মেটেলি চা বাগানটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। বাগান পরিচালনার কার্যকরী মূলধন আসে ব্যাঙ্ক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স থেকে। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪ বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক গড়ে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ খরচ করে থাকে।

মেটেলি চা বাগিচায় খুব সুন্দর এবং গোছানো হাসপাতাল আছে। মূর্তি ডিভিশনে একটি ডিসপেনসরি এবং একটি ডিসপেনসরি মেটেলি ডিভিশনে। আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই বলে জানালেন হাসপাতালের সিনিয়র নার্স সুষমা কন্ডোলিয়া। মেটেলি চা বাগিচায় ওয়ার্ডের সংখ্যা ১২ টি এবং মহিলাদের ওয়ার্ডের সংখ্যাও ১২ টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড আগে ছিল ছয়টি। বর্তমানে তিনটি রয়েছে। মেটারনিটি ওয়ার্ড থাকলেও সমস্ত মেটারনিটি রোগীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা চালসাতে অথবা মালবাজার মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। তবে এখানে অপারেশন করা হয় না। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ৫০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় স্থায়ী ডাক্তারবাবু আছেন। বাগানে ফার্মাসিস্ট একজন। তিনিই কম্পাউন্ডারের কাজ করে থাকেন। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ওষুধের তালিকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। মেটেলি বাগানে নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়।

মেটেলি চা বাগিচায় বাৎসরিক বোনাসের হার কুড়ি শতাংশ। বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। বাগিচায় ক্যান্টিন আছে, তবে ভর্তুকি দেওয়া হয় না। বাগিচার ক্রেশগুলিতে আছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। ক্রেশগুলিতে শৌচাগার আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ঔষধ দেওয়া হয়। পানীয়জল পর্যাপ্ত পরিমাণ। তবে সময় সময় পানীয় জল ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ১৬ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় মেটেলি হাইস্কুল। বাগিচার শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা দুটি। একটি বাস এবং আর একটি ট্রাক। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। আছে খেলার মাঠ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা। মেটেলি চা বাগানটি গত অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে তাদের বকেয়াসহ সম্পূর্ণ অর্থ জমা করেছে। মজুরি, রেশন, চপ্পল, ছাতা, কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের কোনও ক্ষোভ নেই।

সামসিং চা বাগান

সামসিং টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী সামসিং অরগানিক টি কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএ-এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ২০১২ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মোট **চাষযোগ্য উৎপাদন ক্ষেত্র ১২৫৬.৬৮ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য আবাদি জমি থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৫০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। **কর্মরত শ্রমিক ১৫০০**। সামসিং চা বাগিচায় **নিজস্ব উৎপাদিত চা ১৮ থেকে ১৯ লাখ কেজি** এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চা সাড়ে ৪ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে কোনও চা পাতা সংগ্রহ করে ফ্যাক্টরিতে আনা হয় না। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে ইনঅরগানিক সিটিসি চা প্রস্তুত হয়। সামসিং চা বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং রুগ্ন বাগান। তবে বাগানটি আর্থিকভাবে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ নয়। বাগান পরিচালনার কার্যকর মুলধন আসে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীর নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স থেকে।

সামসিং চা বাগানে ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ কোনও পাকা বাড়ি নেই। বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাসের সংখ্যা ১২৩৮। বাগানে শতকরা ৯৪ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ থাকলেও বাসস্থান নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক কোনও টাকাও বরাদ্দ করা হয় না। বাৎসরিক বোনাসের শতকরা হার ২০ শতাংশ হলেও অতটা বোনাস দেওয়া হয় না। গত অর্থবর্ষে কত টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়েছে তা জানা যায়নি। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে কোনও কোনও সময় শ্রমিকদের মজুরি অথবা রেশন অথবা জ্বালানি অথবা বকেয়া মজুরি এরিয়ার হিসাবে দিয়ে দেওয়া হয়। বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ জানা যায়নি। বছরে গড়ে কতজন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন সেটাও জানা যায়নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র মজুরি ছাড়া আর অন্য কোনও সুযোগসুবিধা শ্রমিকেরা পান না বললেই চলে।

সাইরেন বেজে উঠুক, ফের চালু হোক রোজগারের কাজ এটাই কিন্তু প্রতিটি চা শ্রমিকের অন্তরের কথা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সামসিং চা বাগানটি একটি পরিকাঠামোহীন বাগান। বাগিচায় কোনও হাসপাতাল নেই। ডিসপেনসরির সংখ্যা একটিমাত্র। আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে ২০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। কোনও সরকারি বা বেসরকারি ডাক্তার নেই। বাগিচায় নার্স নেই। কম্পাউন্ডার নেই, স্বাস্থ্য সহযোগী নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। ওষুধের তালিকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয় না। সামসিং চা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয় না। পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। বিনোদনমূলক ক্লাব নেই, নেই খেলার মাঠও। সামসিং চা বাগিচার নরেন ভুজেলরা সেই কারণেই দান-অনুদান সাহায্য-সহযোগিতা কোনওটাই মাথা পেতে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা চান নিয়মিত মজুরি, সম্মানের সঙ্গে শ্রমদান করে বাঁচতে। অনুদান নিলেও তারা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে এ হল সামান্য কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা।

একথা সত্যি, চা বাগানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত শাসক দল তাদের দায় ও কর্তব্যের যে খতিয়ান কথায় ও কাজে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে তার কোনও বিকল্পই বিরোধীরা তুলে ধরতে পারেনি। কিন্তু জয়েন্ট ফোরাম মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে ধারাবাহিক

চা-বাগানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত শাসক দল তাদের দায় ও কর্তব্যের যে খতিয়ান কথায় ও কাজে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে তার কোনও বিকল্পই কেউ তুলে ধরতে পারেনি। বিরোধীদল নিজেরাও ঠিক কীভাবে শাসকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তার রণকৌশল এখনও পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি।

আন্দোলন করে শ্রমিকদের আস্থাভাজন হয়েছে এবং বোঝাই যাচ্ছে তার প্রতিফলন পড়েছে ভোটের বাক্সে। বেশিরভাগ চালু বাগানগুলিতেই শ্রমিক মহল্লায় পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আগাগোড়াই অত্যন্ত নিম্নগামী। মালিকপক্ষ শ্রমিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে উৎপাদনেই ব্যস্ত। সেইসব চিত্র কিন্তু বদলায়নি। আজ যখন বিরোধীরা শ্রমিকস্বার্থ থেকে শুরু করে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন কিন্তু চা বাগান শ্রমিক-কর্মচারীরাই অতীতের সঙ্গে আজকের অবস্থানের কোনও ফারাক খুঁজে পান না।

বিরোধীদের মতে, রাজ্যের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে ঋণ নিয়ে 'পাইয়ে দেওয়ার উন্নয়ন'ই বর্তমান শাসক দল করে চলেছে। এর আগেই বাগান ঘুরে দেখা গিয়েছে, দান খয়রাতিতে আপাতত খিদের যন্ত্রণা মিটলেও চা-বাগানের মানুষগুলি চায় বাগান ফের চালু হওয়ার মতো স্থায়ী সমাধান। কারণ এতদিনে তারা সবাই জেনে গেছে, এ সমস্যা বাগান মালিকদের নিজেদের তৈরি, চা-শিল্পের নয়। আমাদের পত্রিকায় বারবার লেখা হয়েছে সে খবর। আবার আমরা বাগানগুলিতে যাব প্রকৃত চিত্র চাক্ষুষ করার বাসনায়, তবে তার আগে এটুকু অনুমান করাই যায়, দীর্ঘ বঞ্চনার ক্লেশ ও শ্রমিক নেতাদের ভণ্ডামি-গুণ্ডামি সহ্য করার পর ডুয়ার্সের চা বাগানে যে আশার আলো তৈরি হয়েছিল নতুন সরকারকে ঘিরে, গত ছ-সাত বছরে তা ক্রমশ ফিকে পড়ে গিয়েছে। জেলাস্তরের নেতারা তার কোনও উন্নতি ঘটাতে পারেননি, উল্টে ভোটের আগে 'অযথা' বলপ্রয়োগ রীতিমত ক্ষুণ্ন করেছে চা বাগানের মানুষকে।

ভীষ্মলোচন শর্মা

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-3 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্সের ইকো রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;
Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner,
Conference Hall;
Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.